চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতার দুই দশক : স্বপ্নভঙ্গের কথকতা (১৯৭১-১৯৯১)

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে যে পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছিলেন অসন্তোষ ও অসম্মান; সরব ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন প্রতিবাদে; সেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কীভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে গেল—সেই ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সেই ঐতিহাসিক বাতাবরণের মধ্যে রচিত প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলির পরিচয় আমরা পেয়েছি। অভিসন্দর্ভের পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমাদের লক্ষ্য হবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের তিন দশকের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে বাংলাদেশের কবিতায় কোন্ কোন্ প্রবণতাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে তা সন্ধান করা।

এই অধ্যায়ের কবিতা আলোচনার পূর্বে আমরা আলোচনার প্রেক্ষিত ও ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এই সময়ের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরবো। ১৯৭১-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা খুব সহজ ও নিশ্চিন্ততার ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রভূত জন-সমর্থন নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালকের আসনে বসলেও, সেই প্রশাসনিক পদাধিকার বিরোধী মনোভাবাপন্ন মানুষদের দ্বারা পরিবৃত ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব দূরদর্শী বলা যায় না। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন ফলে সেই সময় কী কী ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ দেখেননি কিন্তু কারামুক্ত হয়েই তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে প্রশাসনের সমস্ত রাশ নিজের হাতে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁরই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন। উত্থানকাল থেকেই আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিল। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতার অধীনে তিনি সরকার চালাতে সম্মত ছিলেন না। তাই তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে মনোনীত করেন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে। অর্থমন্ত্রী করেন তাজউদ্দীন আহমদকে। তিনি প্রশাসনিক পরিমণ্ডল গঠনের সময় কারো সঙ্গে আলোচনা না করেই নিজের পছন্দ মতো লোককে নির্বাচন করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম ভুল। ক্ষমতায় বসে মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীনের মতো ব্যক্তিকে মন্ত্রীসভা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। এমনকি সামরিক বাহিনীতে জিয়াউর রহমান যোগ্য হলেও তাঁর বদলে সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করেন। কেবল তাই নয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সফিউল্লাহর সেনাপ্রধান পদে মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও জিয়াউর রহমানকে বাদ দিয়ে তিনি পুনরায় সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান পদে পুনর্বহাল করেছিলেন। এটাই তাঁর প্রতি জিয়াউর রহমানের ক্ষোভ এবং ভবিষ্যতে জিয়ার নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি শুরুতেই বাংলাদেশে একটি সংবিধান প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বদলে স্বাধীন বাংলাদেশে গৃহীত হয় সংসদীয় পদ্ধতি। এরপর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ দেশের সাধারণ নির্বাচনে কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগ সিংহভাগ আসনে জয়লাভ করে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। পার্লামেন্ট প্রায় বিরোধীশূন্য হওয়ার কারণে মুজিবুর রহমান নিজের ইচ্ছামত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা শুরু করেন। সরকার-বিরোধী সমালোচনা করার জন্য ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে নিষিদ্ধ করা হয় 'স্বদেশ' এবং 'হক কথা' পত্রিকাকে। এমনকি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর প্রেস এবং পাবলিকেশন আইন জারি করে নিষিদ্ধ করা হয় 'গণকণ্ঠ' পত্রিকাকে।[১]

এই ঘটনার পর ধীরে ধীরে মুজিব-সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা যায়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল দেশব্যাপী সরকারি অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক

কৃষক সমাজবাদী দল একত্রে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দমন আইনসহ চার দফা দাবি প্রণয়ন করে। এই দাবিগুলি জনগণের সামনে উপস্থাপনের জন্য ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল ঢাকার পল্টন ময়দানে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বিপুল জনসমাবেশ মুজিব সরকারকে ভীত করে তোলে। এই জনসমাগম থেকে মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের জনগণ এখন তাদের অপূর্ণ দাবিদাওয়া আদায়ে উন্মুখ। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। অনেকেই মনে করেন ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাক্‌শাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠনের আদেশ জারি করে তিনি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন একদলীয় শাসন।[২] সেই সঙ্গে স্বজনপোষণ এবং দলীয় দুর্নীতিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেনাবাহিনীর কর্তারা। তখন থেকেই মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। লে: ক: রশীদ, লে: ক: ফারুক, মেজর পাশা, মেজর হুদাসহ কয়েকজন সেনাপ্রধানের মিলিত ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট আত্মীয়-স্বজনসহ শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। দেশবাসীর একাংশ বিচলিত হলেও কিছু মানুষ কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থনও করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগত চার নেতা—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম. মনসুর আলী, ও এইইচ. এম. কামরুজ্জামানকে ঐ বছর ৩ নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়।

মুজিবের অবর্তমানে ঐদিনই খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বস্তুত মোশতাকের এই ক্ষমতা গ্রহণকেও পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক বলা চলে। কারণ দেশের সংসদীয় সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নয়, মুজিব হত্যাকারী সাতজন অফিসারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেই মোশতাক ক্ষমতায় বসেছিলেন। ক্ষমতায় বসেই মোশতাক তাঁর সম্ভাব্য শত্রুদের নির্মূল করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র বিরাশি দিন। এই সময়ের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ

দুটি আদেশনামা জারি করেছিলেন--১৫ অগাস্ট মুজিবুরের হত্যাকারীদের এবং ৩ নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের চার নেতার হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না। এর পরেই মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীতে আবার অভ্যুত্থান ঘটে। ৬ নভেম্বর খন্দকার মোশতাক আহমেদ পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। এই সময় চীফ-অফ-আর্মি স্টাফ হিসাবে নিযুক্ত জিয়াউর রহমানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং তাঁকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাসভবনে বন্দি করে রাখা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীতে জিয়াউর রহমান জনপ্রিয় হওয়ার কারণে এই গৃহবন্দি সৈন্যদের একাংশের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ফলে ক্ষুব্ধ সেনাসদস্যরা পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ৭ নভেম্বর কারাবন্দি সেনাধ্যক্ষ জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষমতালোভী ও অদূরদর্শী হওয়ার কারণে তাঁর আমলে একাধিক গণ-অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক গণ-অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন।[৩] জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য অনুচর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের দশম রাষ্ট্রপতি হন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ। তিনিও জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক দশক বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। অবশেষে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর গণ আন্দোলনের চাপে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি. একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া। দুই দশকের এই দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক দুরবস্থাও বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে সঙ্কটপূর্ণ করে তুলেছিল।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা শুরু হয়েছিল তাজউদ্দীন আহমদ-এর সময় থেকেই। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও তাজউদ্দীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ২০ ডিসেম্বর। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি তিনি দেশের মুদ্রামান ৬৬ শতাংশ কমিয়ে দেন।[৪] এই সময় বাংলাদেশের মুদ্রার পরিমাণ ভারতের থেকেও বেশি ছিল। তাজউদ্দীন মুদ্রার মান কমিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনীতির মধ্যে

একটা সমতা আনতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলায় প্রথম অর্থনৈতিক ধাক্কা। স্বাধীন দেশ হয়েও প্রথম থেকে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি শুরু থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং দ্রব্যমূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পুরো অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। কলকারখানা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি, রাস্তাঘাট, সড়ক-সেতু ও রেলসেতুসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা সবকিছুই ভেঙে পড়েছিল। এই সময় গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমনকি রপ্তানির ক্ষেত্রে পাটশিল্পের উপর একান্ত নির্ভরতা কমানোর জন্য সার, সিমেন্ট, কাগজ শিল্প গড়ে তোলার প্রস্তাবও নেওয়া হয়।[৫] কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি কোনোটিই সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে পাঁচ বার সরকার পরিবর্তিত হয়। বারংবার সরকার গঠন এবং পতনের পিছনে ছিল এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষা। স্বাভাবিকভাবে গণতন্ত্র-বিরোধী এই সব শাসক জনগণের আশাপূরণে বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা দেখায়নি। প্রত্যেকেই বাংলাদেশকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সে-কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্পনীতি সেভাবে বিকাশলাভ করেনি। ফলে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

রাষ্ট্রের এই অবহেলা কেবল শিল্পের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকেনি। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিও এই সময় চূড়ান্ত অবহেলিত হয়েছিল। ফলে পরাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষকরা স্বাধীন বাংলাদেশে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হন। ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রামীণ পরিবারের গড় আয় ছিল শহরে বসবাসকারী পরিবারগুলির আয়ের ৬২ শতাংশ। ১৯৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই আয়ের পরিমাণ কমে ৫৬ শতাংশে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কবলে পড়ে বাংলাদেশের কৃষি-

ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ মহামারীর আকার ধারণ করে। মূলত সরকার পরিচালিত রেশনিং ব্যবস্থার অরাজকতা, চোরাচালান ও দুর্নীতি এবং ভূস্বামীদের নির্মম কৃষক-শোষণ ছিল এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। এর ফলে বাংলাদেশে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। ১৯৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে ভিটেমাটি শূন্য সর্বহারা পরিবার ৯ শতাংশ, কুঁড়েঘর আছে কিন্তু ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ২০ শতাংশ, আর ভূমিহীন প্রায় ২৮ শতাংশ। সবমিলিয়ে সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫৭ শতাংশ।[৬]

স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুই দশকের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আশাপ্রদ হয়ে উঠতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেটি বিশেষত যে-সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে তার একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে এই সময়ের প্রতিফলন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং শিল্পী-সাহিত্যিকরা স্বদেশের সামগ্রিক পরিবেশকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন তারও অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় এই সময়ে রচিত কবিতায়। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের কবিতাকে এই দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হবে। বর্তমান চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশক অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৭১ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দুই দশকের প্রধান কবিদের কবিতা ছাড়াও পাঁচ ও ছয়ের দশকের কবি, যাঁদের চিন্তা-চেতনা-সৃজন এই সময়পর্বেও সক্রিয় ছিল, তাঁদের কবিতাকেও আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার্থে গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘ এই দুই দশকে যে-সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে সেখানে কয়েকটি প্রবণতা ও মনোভঙ্গি লক্ষ করা যায়। এগুলি হলো—১. প্রাথমিক স্বপ্নভঙ্গ, ২. রাজনীতি সচেতনতা, ৩. আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ৪. দুঃসময় উত্তীর্ণ হওয়ার আশাবাদ প্রভৃতি। এই প্রবণতাগুলিকে সামনে রেখে বিভিন্ন কবির কবিতায় কীভাবে সেগুলি পরিস্ফুট হয়েছে, ভাষারূপ পরিগ্রহ করেছে আলোচ্য অধ্যায়ে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১. প্রাথমিক স্বপ্নভঙ্গ

পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বসাধারণ রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিলেন 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রকে। স্বাভাবিকভাবে এই রাষ্ট্রকে ঘিরে তাঁদের প্রত্যাশার পারদ ছিল ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে জনগণের এই স্বপ্নপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বাধীন দেশের ক্ষমতা দখলের জটিল রাজনীতি। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো কোনও শক্ত ভিতের ওপর গ্রথিত হতে পারেনি কারণ সদ্য গঠিত দেশকে সুসংসহভাবে পরিচালনা করার মতো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতৃবর্গ বা প্রয়োজনীয় অর্থ কোনোটিই সে-দিনের বাংলাদেশ পায়নি। রাজনৈতিক মুক্তি এলেও অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল অধরা। এর ফলে শুরু থেকেই বাংলাদেশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অবিবেচনার ফলে দেশের অভ্যন্তরে শুরু হয় খুন, ধর্ষণ, লুঠতরাজদের রাজত্ব। কর্মসংস্থানের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় দেশে বাড়তে থাকে বেকারত্ব, দুর্নীতি, চোরাচালান। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণের মন থেকে মুছে যেতে থাকে স্বাধীনতার স্বপ্ন, শুরু হয় স্বপ্নভঙ্গ। আর্থ-সামাজিক জীবনের এই দুর্দশা সাহিত্যেও সমান প্রভাব ফেলেছিল। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতাও এক নতুন প্রত্যাশায় নতুন পথে অগ্রসর হবে এই আশা ছিল। কিন্তু সমকালে জনমানসের এই স্বপ্নভঙ্গ এই সময়ের কবিদেরও প্রভাবিত করেছিল। এ-সম্পর্কে সমালোচক রফিক্‌উল্লাহ খান বলেছেন—''এ সময়ের কবিতায় দেখা গেল প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নতুন চারিত্র্য; সংগ্রামী জীবনাকাঙ্ক্ষার নবতর মাত্রা; শ্রেণিবৈষম্য সম্পর্কে সজাগতা ও শ্রেণিসাম্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং এজন্য নবতর সংগ্রামের প্রস্তুতি।''[৭] স্বপ্নভঙ্গের এই আখ্যান সত্তরের দশকের নতুন কবিদের পাশাপাশি যাঁরা পূর্ববর্তী দশকের কবি তাঁদেরকেও সমানভাবে প্রভাবিত করেছে। কারণ তাঁরা ছিলেন এই দীর্ঘ জ্বলন্ত সময়ের সাক্ষী। ফলে স্বাধীনতার এই করাল রূপ দেখে এই সময়ের কবিরা আর্তনাদ করে উঠেছেন। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোয় কবি হাসান হাফিজুর রহমান লক্ষ করেছেন স্বাধীন দেশের মানুষের মধ্যে আনন্দের রেশটুকু নিজের অজান্তেই মিলিয়ে গেছে। চারিদিকে কেবল শূন্যতা। এই

শূন্যতাবোধ কবির মনে প্রশ্নচিহ্নের জন্ম দিয়েছে। কবি সরাসরি স্বাধীনতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছেন। কারণ দেশ আজ স্বাধীন। শোকের সীমানা পার করে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতির কোলে ছায়ামুক্ত শ্বাস গ্রহণে উন্মুখ, কিন্তু বর্তমানের হানাহানি অতীতের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে স্বাধীনতাকে এভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে কবি বলেছেন—

'তবে,
সাম্য আজো সোনার হরিণ,
গণ-অধিকারে এ ওর ভয়ে ভীষণ অস্থির।
কারো কাছেই বুঝি মুক্তির ছাড়পত্র নেই, হয়তো কোথাও
মনুষ্যত্ব নেই বলে।

তবু শহীদের রক্তে বারবার ভিজে যাচ্ছে মাটি।
আমার আনুগত্য রাখি কোথায়, কোথায় রাখি আমি?'[৮] (আমার আনুগত্য)

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম তিন বছরে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। স্বাভাবিকভাবে নিজের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বদেশের কাছে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর কাছে বাংলাদেশের সর্বসাধারণের চাহিদা ছিল প্রত্যাশিত। আধুনিক জীবনযাপনের চাওয়া-পাওয়া নয়—তাঁদের ন্যূনতম দাবি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান যা তাঁরা পাকিস্তানের অধীনে থাকাকালীন পায়নি, তা পেলেই তাঁরা খুশি হত। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার সেই দাবি পূরণেও ব্যর্থ হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প সবদিক থেকেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। দেশে শুরু হয় অরাজকতা। এই অরাজকর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো পরিকাঠামো বাংলাদেশের ছিল না। আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, চোরাচালান, হানহানিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নের সকাল দ্রুতই দুঃস্বপ্নের রাত্রিতে পরিণত হয়েছিল। নেতৃবর্গের এই প্রশাসনিক ব্যর্থতায় জনগণের এই স্বপ্নভঙ্গের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে নির্মলেন্দু গুণের কবিতায়—

'আমার কিছু স্বপ্ন ছিলো, আমার কিছু প্রাপ্য ছিলো
একখানা ঘর সবার মতো
রোজ সকালে একমুঠো ভাত লঙ্কা মেখে খাবার
একজোড়া চোখ অপেক্ষমান। এই তো চেয়েছিলাম
স্বপ্ন ছিলো স্বাধীনতার
আর কিছু নয়
অনঙ্গ বউ, অনঙ্গ বউ
একজোড়া হাঁস
একজোড়া চোখ
কোথায়? তুমি কোথায়?'[৯] (আমার স্বপ্ন ছিল)

কেবল নির্মলেন্দু গুণ নয় বাংলাদেশের অনেক কবিই, এই অপূর্ণ স্বাধীনতার কাছে তাঁদের অপ্রাপ্তিজনিত প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন—

১) 'কোন দিকে নিয়ে যেতে চাও আমাকে? কোনদিকে গাইড
পদদ্বয় প্রোথিত স্বপ্নভূমিতে,
আমাকে যেন উপড়ে নিতে চাও?
কেন তোমরা মায়াবৃক্ষের ছায়া থেকে
সরিয়ে নিতে চাও আমাকে? কেন?
উদ্বাস্তু করতে চাও স্বপ্নভূমি থেকে?'[১০] (কোনদিকে)

২) 'হে প্রিয় স্বাধীনতা
কী পাপ, কোন ক্লেদ জড়ায়ে এনেছো ফের তোমার ঠিকানায়?'[১১] (এখন জ্যান্ত মানুষের মতো)

৩) 'স্বাধীনতা, তুমি কেন কারো খাসতালুক এমন?

অথবা তোমাকে নিয়ে কেন আরো অবিরাম
ফূর্তির খোরাক
স্বাধীনতা, তুমি আজ কেন ফের শহরের দাম্ভিক কারফিউ!'[১২] (এখন তোমাকে)

৪) 'এই কি বিজয়?
যুদ্ধকালীন সেই মহানন্দপুরের স্বাধীন বৈভব ওর চোখের তারায় কই?
ওর চোখের আকাশে সেই আলো নেই কেন?
যা মহানন্দপুর শালবনে একবার দেখেছিলাম বিজয়ের চোখে
আমি সেই স্বাধীনতার আলো পেয়েছিলাম,
আর সেই সঙ্গে সাত কোটি কণ্ঠস্বর গেয়েছিলো বিজয়ের গান।'[১৩] (বিজয় আমার স্বাধীনতা)

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের আত্মদানের মধ্যে দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তা অক্ষুণ্ন থাকেনি। এর কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা। যে আদর্শের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই আদর্শচ্যুতির ফলে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের স্বার্থান্বেষী মুখোশটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পরে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশেও রোজ কান্নার রোল ওঠে, মাঠে-প্রান্তরে পড়ে থাকে মানুষের মৃতদেহ। স্বদেশ ও রাজনীতির এই নৈরাশ্য কবিদের মনেও একধরনের হতাশার জন্ম দিয়েছে। তাই আবিদ আজাদের মতো কবি বিষণ্নভাবে বলে ওঠেন—

'কী হবে গণতন্ত্র পেয়ে যদি কাঁধে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন আর বুকে বুলেটের
জ্যোৎস্নাজ্বলা গর্ত নিয়ে ঝিলের জলে ভেসে থাকে অজ্ঞাত যুবকের লাশ?
যদি শীতের মফস্বল শহর থেকে কাঁচা হাতের লেখা নিয়ে নিরুদ্দেশ

ভাইয়ের
ঠিকানা ঘুরে রোজ-রোজ ফিরে যায় ছোট বোনের চিঠি?
যদি আমি রুমাল হারিয়ে বারবার ফিরে আসি বিষণ্ন সন্ধ্যায়
যদি আমি দাঁড়াতে না পারি আর ঝাউগাছের মতো একা
তাহলে হবে না। আমি বলছি হবে না। হতে পারে না।'[১৪] (আমি বলছি কিচ্ছু হবে না)

সাতের দশকের অন্যতম প্রতিবাদী কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর কাছে স্বাধীনতার মূল্য হল রক্তের বিনিময়ে পাওয়া বেঁচে থাকার রসদ। কিন্তু স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার মর্যাদাহানি, শত্রুদের উত্থান ও আস্ফালন কবিচিত্তকে বিচলিত করেছে। রক্তক্ষয়ী ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত হতে দেখে কবি আঁতকে ওঠেন। দেশের প্রতি ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা কবিসত্তাকে জাগ্রত করে তোলে। কিন্তু দেশকে বাঁচাতে না পেরে তিনি স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কাতর হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতা পেয়েও মুক্তি আসেনা, দেশের তরুণ সমাজ স্বাধীনতার মূল্য বোঝেনা, রাজনীতিকরা নিজের সুবিধার জন্য দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দেন। মানুষের রক্ত, ঘামের মিশ্রণে তৈরি বাসভূমি, মানুষের চক্রান্তেই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। চোখের সামনে এত কিছু দেখেও কবি কিছু করতে পারেন না। এই অক্ষমতাজনিত ক্ষোভ তাঁর অন্তরে যে ঘৃণার সঞ্চার করে সেখানে প্রতিবাদ ও স্বপ্নভঙ্গ পাশাপাশি অবস্থান করে। এই রকম ভাবনা ফুটে উঠেছে 'হাড়েরও ঘরখানি' কবিতায়—

'বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
রাজনীতিকের ধমনী শিরায় সুবিধাবাদের পাপ
বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
বুদ্ধিজীবীর রক্তে স্নায়ুতে সচেতন অপরাধ
বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
জাতির তরুণ রক্তে পুষেছে নির্বীর্যের সাপ-'[১৫] (হাড়েরও ঘরখানি)

শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় আসীন হলেও জনগণের প্রতিটি স্বপ্ন পূরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতিতে ছিল ভ্রান্তির বীজ। গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতায় থেকেও তিনি 'লাল বাহিনী' গঠন করেছিলেন। এই বাহিনীর কাজ ছিল শাসকের বিরুদ্ধে যেকোনো কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়া। ফলে সরকার চালানো এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সরকারের সমালোচনা করার মতো বিরোধী নেতা না থাকায় মুজিবুর রহমান সর্বাধিনায়ক হয়ে উঠেছিলেন।

গণতন্ত্রের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হল পত্রপত্রিকা তথা সংবাদ মাধ্যম। এই সময় অল্পসংখ্যক যে-সমস্ত পত্রিকা সরকারের সমালোচনা করেছিল তাদেরকে নিষিদ্ধ করে সরকার-বিরোধী সমালোচনার সকল পথ রুদ্ধ করেছিলেন মুজিবুর রহমান। যিনি ক্ষমতায় বসে দেশকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন তিনিই নিজের অজান্তে সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গবন্ধু, যিনি আন্তরিকভাবে দেশবাসীকে ভালোবাসতেন তাঁর এই আচরণ পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানুষের মনে একাত্তর-পূর্ববর্তী শাসকের অত্যাচারের আতঙ্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। একাত্তর-পূর্ববর্তী পুরানো সেই দিনের আগমন সম্ভাবনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বিমল গুহের কবিতায়, যেখানে আর্তনাদের সঙ্গে সত্যভঙ্গ যুগপৎ মিলে যায়—

'বাতাসে পুরানো গন্ধ ভেসে আসে
যেখানেই যাই—ঘরে কিংবা অফিসে, রাস্তায়
পিছু পিছু একটি নিঃশব্দ বীভৎসতা ধাওয়া করে
যেন পাগলা কুকুর
আমাদের তাড়া করে বেড়ায় প্রত্যহ,
পরস্পর একটি সত্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ক্রমশ
বীভৎসতা ধাওয়া করে পিছু পিছু।'[১৬] (বাতাসে পুরানো গন্ধ)

নিজ চিন্তাপ্রসূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচিগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মুজিবের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায় এবং শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকা অনিশ্চিত

হয়ে পড়ে। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে তৎপর হন। এজন্য তিনি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি সংবিধান সংশোধন করে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটাতে সচেষ্ট হন। নিজস্ব দল আওয়ামী লীগসহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে তিনি বাক্শাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠনের আদেশ জারি করেন এবং দেশের সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাংসদদের বাধ্যতামূকলভাবে বাক্শাল-এ যোগ দিতে বাধ্য করেন। তাঁর এই হঠকারি কার্যকলাপ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করতে শুরু করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একাধিক রাজনৈতিক দল বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সেনাবাহিনীর অসন্তুষ্ট অফিসাররাও এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে মুজিব হত্যার নীল-নক্সা প্রস্তুত করতে শুরু করেন। সমস্ত দেশ অরাজকতায় ভরে ওঠে। এই অস্থির সময়ের বাংলাদেশ বিশেষ করে ঢাকা শহরকে প্লেগের শহরেরর সঙ্গে তুলনা করে কবি ময়ুখ চৌধুরী বলেছেন—

> ‘প্লেগের শহরে আর কোন বংশীবাদক আসবে না।
> যে ছিলো সে প্রতারিত হয়ে ফিয়ে গেছে, মনে দুঃখ নিয়ে;
> বস্তুত বেঁচেই গেছে, তবু যদি আসতো আর একবার
> শিশুর দলের সাথে নেচে নেচে চিরতরে আমি
> চলিয়া যেতাম আহা, প্লেগের শহর ছেড়ে দূরে বহুদূরে।’[১৭] (প্লেগের শহর)

কবিতাংশটিতে ‘হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা’ গল্পের ছায়াপাত আছে। জার্মানির হ্যামেলিন শহরে ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করে। কথিত আছে এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মেয়রের নেতৃত্বে হ্যামেলিন পৌরসভার মিটিংয়ে স্থির হয় যে যিনি এই রোগের হাত থেকে শহরবাসীকে মুক্তি দেবেন তাকে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেওয়া হবে। এই খবর শুনে হাজির হয় এক রহস্যময় বাঁশিওয়ালা। সে তার বাঁশির সুরে সমস্ত ইঁদুরকে গর্ত থেকে বের করে তাদের ওয়েজার নদীতে নিক্ষেপ করে হ্যামেলিন

শহরকে প্লেগমুক্ত করেন। কিন্তু মেয়র তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বাঁশিওয়ালাকে তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেন। প্রতারিত হয়ে বাঁশিওয়ালা শহর ছেড়ে চলে যায়। কবি এই প্রতারিত বাঁশিওয়ালার সঙ্গে গণতন্ত্রের তুলনা করেছেন। বাংলাদেশের জনগণও ভেবেছিলেন দেশ স্বাধীন হলে, গণতন্ত্র ফিরে আসলে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। গণতন্ত্র বাঁশিওয়ালার মতোই বাংলাদেশ ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। এরপর এক ধর্মীয় উৎসবের দিনে সেই বাঁশিওয়ালা আবার হ্যামেলিন শহরে হাজির হয়। এবার তার বাঁশির শব্দে শহরের সমস্ত শিশুরা তার সঙ্গে বিদায় নেয়। কবিও কামনা করেছেন গণতন্ত্র আক্রান্ত বাংলাদেশেও যেন একবার সেই বাঁশিওয়ালার আগমন ঘটে যাতে কবি এই গণতন্ত্রহীন অসুস্থ বাংলাদেশ ছেড়ে বাঁশিওয়ালার সঙ্গে সুস্থ কোনো সমাজ জীবনে ফিরে যেতে পারেন। কবির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার অজুহাতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হলে বাংলাদেশের রাজনীতি নতুন পথে মোড় নেয়। সেনাবাহিনীর সহায়তায় খন্দকার মোশতাক আহমেদ বেআইনিভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন এবং বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী মোশতাকের রাষ্ট্রপতি হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। কারণ রাষ্ট্রপতি না থাকলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। উপ-রাষ্ট্রপতি না থাকলে সে দায়িত্ব পালন করবেন সংসদের স্পিকার। মোশতাক এর কোনোটাই ছিলেন না। কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় ভর করে তিনি দেশের শাসন ক্ষমতায় বসেছিলেন। সেনাপ্রধান হয়েছিলেন জিয়াউর রহমান, এবং মেজর জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। এরা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এভাবেই মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর দেশের ক্ষমতা ধীরে ধীরে চলে যায় ঘাতকদের হাতে। এই ঘটনা প্রতিবাদের আকারে শিল্পিত রূপ পেয়েছে কবিতায়—

১) ‘দেশের পতাকা নিয়ে ঘাতকেরা চক্রান্তে মেতেছে
সবচেয়ে হিংস্র আর ভয়ঙ্কর যাদের স্বভাব,

যাদের কেবল আছে অতি তীক্ষ্ণ দাঁত ও নখর....
দেশ ও রাষ্ট্রের ভার দেখি আজ তাদেরই হাতেই,
তারাই শাসন করে মেধা আর দীপ্ত মনীষাকে।
কখনো যাদের চোখে স্বপ্ন আর আবেগ ফোটেনি
ভালোবাসি, ভালোবাসি বলে দেশ তারাই মাতায়।'[১৮] (ভালোবাসি বলে দেশ তারাই মাতায়)

২) 'অথচ কী আশ্চর্য সময়,
ব্যথিত পতাকা ওড়ে দেশদ্রোহী খুনীর গাড়িতে!'[১৯] (আশ্চর্য সময়)

৩) 'আমি যে সময়ে বেঁচে আছি
সে সময় এমনই ক্ষুধার্ত খেয়ে নেয় নান্দনিক
আর মানবিক যত বোধ! এইসব দেখে
চিন্তাশক্তি লুপ্তপ্রায়;
খুনীদের মুখে অনর্গল দেশপ্রেম
বৃষ্টির ধারায় ঝরে যায়!'[২০] (আমার সময়)

সত্তরের অধিকাংশ কবির কবিতায় ব্যক্তিগত শিল্পসিদ্ধির তুলনায় সর্বজনীন স্বদেশচেতনাই অধিক সত্য হয়ে উঠেছিল। কবিতা এই সময়ের রাজনীতির স্রোতকে ছুঁয়ে গেছে প্রবলভাবে। আনন্দ, বিষাদ, হতাশা প্রত্যাশা, শোক, প্রতিবাদ সবমিলিয়েই এই পর্বের কবিতার শরীর নির্মিত হয়েছে। আবেগের প্রাধান্য এই সময়ের কবিতার শিল্পধর্মকে অনেকখানি ক্ষুণ্ন করেছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এই আবহের বাইরে গিয়ে কবিদের পক্ষে কবিতা রচনা করা সহজ ছিল না। তাই মোটের ওপর সত্তরের কবিরা গুলি, বারুদ, কার্তুজ ও স্টেনগানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের প্রতিবাদ ও স্বপ্নভঙ্গকে প্রকাশ করেছেন।

সত্তরের শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক নৈরাজ্য পেরিয়ে আশির দশকের শুরুতে পুনরায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক গণ-অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। ২০ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসাবে আব্দুর সাত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। সেনাপ্রধান হিসাবে দেশের ক্ষমতা দখল করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। আবার রক্তে ভিজতে শুরু করে বাংলাদেশের মাটি। সামরিক শাসন ক্রমশই জগদ্দল পাথরের মতো বাঙালি জীবনে চেপে বসতে শুরু করে। শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, রাজনৈতিক সন্ত্রাস বিপজ্জনক মোড় নেয়। সীমাহীন দুর্নীতি, দলীয় দাসত্ব, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সমাজ-রাজনীতির চিত্রটাকেই বদলে দেয়। এইপর্বের কবিরা প্রতিনিয়ত দেখেছেন তাঁদের স্বপ্নগুলো সামরিক বাহিনীর গুলির শব্দে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। কিন্তু পূর্ববর্তী দশকের কবিদের মতো এই সময়ের কবিতার কণ্ঠস্বর অতটা উচ্চকিত নয়। বরং অত্যন্ত নীরবতার সঙ্গে রূপকের মধ্যে দিয়ে কবিরা নিজেদের অপূর্ণতাকে ব্যক্ত করেছেন। চারপাশে রক্তমাখা পরিবেশ, জনগণের স্বপ্ন সেখানে বুলেট বিদ্ধ। কিন্তু প্রতিবাদ বা ব্যর্থতার আর্তনাদ নয়, আত্মগত কথোপকথনের মধ্যেই ফুটে উঠেছে এই পর্বের কবিদের স্বপ্নভঙ্গ। উল্লেখ করা যায় কবি জাহিদ হায়দারের কবিতা—

'আমার স্বপ্নগুলোকে
আক্রমণ করে হেলমেট পরা ছায়া।

বহুযোজন দূরে আমার শৈশব, সারল্য আমার,
তৃতীয় মানুষদের সবগুলো হাত একসাথে করে
দূরকে স্পর্শ করতে যেয়ে
দেখলাম, তাকে রক্তাক্ত করে
পা নাচিয়ে হাসছে হেলমেট পরা ছায়া।'[২১] (হেলমেট পরা ছায়া)

কেবল জাহিদ হায়দার নয় আশির অনেক কবির কবিতাতেই সামরিক শাসনে জনগণের স্বপ্নভঙ্গের বিষয়টি ফুটে উঠেছে—

১) 'তখন স্বদেশজুড়ে শকুনের ওড়াউড়ি, পাখসাটে
বয়ে আনে মৃত্যু
গ্রামগঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় তীব্র বেগে ধেয়ে আসে
চকচকে হেলমেটবাহী ট্রাক
মাঝরাতে কারো কোনো বিপন্ন চিৎকারে
ছত্রখান হয়ে যায় হিম নীরবতা
ধারালো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে যায়
ভয় পেয়ে নিশির কুকুর।'[২২] (মুক্তি ও বিপ্লবের কবিতা)

২) 'আনন্দ করছে অন্ধ ও মূর্খেরা
স্তব্ধ শ্রমণের মুখে এসে পড়ে ঝলমলে রোদ

'ভয়াল মৃত্যসন্ধি বন্দী করে ফেলে
সমুদ্রকে জ্যোৎস্নাকে'[২৩] (আর্তনাদ করছে মানুষের প্রেত)

৩) 'বন্যতা, তাণ্ডব, রক্তপাত, পাহাড়ি বৃষ্টির মতো গুলি-
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলজুড়ে মানুষ
নড়েচড়ে ওঠে,
হৃদয়ের প্রচ্ছেদে বেদনার নীল রঙ,
দুচোখের বাঁকে স্থির জলের রেখা।'[২৪] (অগ্নিময় রাত)

আশির দশকের শুরু থেকেই শেষপর্যন্ত স্বৈরাচারী রাজনীতি, দুর্নীতি ও অনৈতিক অনাচারের শাসন অবাধে চলতে থাকে। দ্রুত গড়ে উঠতে শুরু করে উচ্চবিত্ত সমাজ। এই

সময় সমাজের প্রতিটি অংশেই দুর্নীতি এমনভাবে থাবা বসায় যে সুবিধাবাদের রাজনীতি বড়ো হয়ে উঠতে শুরু করে। একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী, কবি, সাংবাদিক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লোভে, রাজনৈতিক আনুগত্যলাভের জন্য আত্মবিক্রয়ে উন্মুখ হয়ে ওঠেন, নাম লেখান শাসক শিবিরে। সাংস্কৃতিক এই অবক্ষয় ব্যথিত করেছে এই পর্বের বিবেকবান কবিদের। আত্মবিক্রয়ের এই চিত্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে শিমুল মাহমুদের কবিতায়—

> 'এইখানে সুলভমূল্যে
> শস্যবীজ শস্য-আত্মা, দেহকাঠামো বিক্রয় হয়।
> রৌদ্রবৃষ্টি বারান্দা হেঁটে হেঁটে কিষাণেরা বেলা
> হাটখোলা তেমাথায় গিয়ে ভিড় করে।'[২৫] (পাটরচনা)

কবিদের এই আত্মবিক্রয়ের কথা ফুটে উঠেছে শাহীন রেজার কবিতায়ও। অতীতের কবিদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি সমাজের প্রতি কবিদের দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন কবিরা সমাজের পথদ্রষ্টা। তাঁরাই মানুষকে পথ চিনতে শেখায়, স্বপ্ন দেখায়। কবিদের কাজ রক্তাক্ত হানাহানির ঘেরাটোপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে সুস্থ ভোরের আলো দেখানো। কিন্তু এই কবিরাই যখন স্বীয় কর্তব্য ভুলে আপন স্বার্থসিদ্ধির লোভে শাসকের কাছে মাথা নত করে তখন সমাজের মেরুদণ্ডও একইভাবে নুয়ে পড়ে। তাই সুবিধাভোগী এইসব কবিদের আক্রমণ না করে নিজেকের বিবেকের কাছেই হতাশ কবির প্রশ্নবাণ—

> 'আমি কবি
> বেঁচে আছি পাখি ও কবিতার কাছাকাছি
> আমি কেন ভুল পথে যাবো?'[২৬] (কেন ভুল পথে যাবো)

মানবাত্মার এই অপমান দেখে শুদ্ধচারী কবি নিজেকে আর এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারেন না। ধীরে ধীরে সব বন্ধন ছিন্ন করেন এই ভোগসর্বস্ব সমাজের সঙ্গে। কিন্তু চাইলেও পাকাপাকি বন্ধন মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়, তাই কবিকে ফিরে আসতে হয় ভিন্ন রূপে। কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনও ফিরে এসেছেন এই পঙ্কিল সমাজের বুকে।

দেখছেন সুবিধাভোগী মানুষের কর্মময় জীবনকে। যারা দিনের আলোয় সৌন্দর্যের পূজারী, রাতের অন্ধকারে তারাই ধর্মের দোহাই দিয়ে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। চোখের সামনে মানুষের এই দ্বিচারিতা দেখে কবি বলে ওঠেন—

‘ক্রমে শবযাত্রা দীর্ঘতর হলে লাগলো। তোমাদের লম্পট কবিরা
আর সংস্কৃতির ধাড়ি শকুন হাফ আমলা। মোল্লা ধড়িবাজ,
গলায় ক্রুশ এ যুগের যুডাস—
সকলেই যোগ দিল সে যাত্রায়: ঈশ্বর-প্রশস্তি উঠলো গলায় গলায়
ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করতে লাগলো সবাই-’[২৭] (এলিয়েন)

দীর্ঘ সামরিক শাসনের যাঁতাকলে সোনার বাংলাদেশ আজ শবনগরীতে পরিণত হয়েছে। নাগরিক সমাজের বিকারগ্রস্ততায় কবি-আত্মা আজ মৃত। কবিরা দেখছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশে আজ কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই। সবাই আজ লাশের মতো স্পন্দনহীন, নির্জীব দেহমাত্র। আশৈশব দেখে আসা পথ-ঘাট আর স্মৃতির মণিকোঠা থেকে বিস্মৃত, চারপাশের চিরচেনা মানুষগুলো পর্যন্ত আজ অচেনা। চারিদিকে কেবল ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি—

‘দুপুরের সাইরেন বেজে বেজে ডেকে আনে অন্তর্জ্বালা
একদিন এই মাঠ-গুল্ম-লতা-ঝোপ-ঝাড় ছিল স্বতঃস্ফূর্ত
অস্তিত্বের মর্মমূলে আজ দেখ বিষাদ বিমূর্ত
সবুজ প্রান্তর নেই, উধাও অনন্ত মেঘমালা’[২৮](বিপ্রতীপ)

গণতন্ত্রের এই লাঞ্ছনার পটভূমিতে মজিদ মাহমুদের মতো কবিরা স্মরণ করেছেন বাংলাদেশের পূর্ব ইতিহাস। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তিতে যে দেশ গঠিত হয়েছিল সেখানে বাঙালিদের প্রাপ্তির ভাঁড়ার ছিল শূন্য, চব্বিশ বছরের সেই বঞ্চনাকে মুছে ফেলতে একাত্তরে বাঙালি নিজের রক্তের বিনিময়ে গঠন করেছিল স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। কিন্তু রক্ত ঝরলেও তার বিনিময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। দেশ আজও ছয়ের দশকের মতোই সামরিক শাসনের কবলে। চোখের

সামনে এতকিছু দেখেও কবি প্রতিবাদ করতে পারছেন না। হারিয়ে ফেলেছেন নিজের ভাষা। তাই নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছেন কবি—

'বছর বিশেক আগে যে মাটি আমাকে ধরেছিল প্রথম
একাত্তরের হানাদার আগুন তার চিহ্ন রাখেনি, এখন
ছাপান্ন হাজার মাইলের সীমাবদ্ধতায় কেটে যায় দিন
স্বৈরাচার ধরে আছে কান, তবু জাগে না আমার মরহুম।'[২৯]
(মাহফুজা মঙ্গল)

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সমাজে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তারিক সুজাত'-র কবিতায়। কবি দেখছেন লোকালয়ের আলো ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে, দুপুরের ঝাঁঝমাখা পরিবেশে নেমে আসছে রাত্রির আলো অন্ধকার। সময়ের চাবুক প্রহারে কবি আজ সর্বহারা উদ্বাস্তু। কবির চোখে একদিকে ভেসে ওঠে রোগা বিবর্ণ সন্তানের মুখ, অন্যদিকে পাকা ফসলের ক্ষেত জ্বলজ্বল করে ওঠে জলের চিতায়। চাইলেও সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না কবি। সময় যেন উল্টোপায়ে হেঁটে চলেছে। আর সমগ্র জরাগ্রস্ত জাতিও ভূতগ্রস্ত সময়ের পদচ্ছাপ অনুসরণ করে খাদের কিনারায় এসে পড়েছে। সমস্ত কিছুর পেছনে রয়েছে একশ্রেণির মানুষের চক্রান্ত। তারাই ক্রমাগত দেশকে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির এই অবক্ষয় দেখে তাই কবির প্রশ্ন—

'হে আমার তিরিশ-বয়সী যুবা
রক্তাক্ত স্বদেশ
তোমাকে টেনেহিঁচড়ে মর্গের দিকে
নিয়ে যাচ্ছে কারা?'[৩০] (সময়কে আমি উল্টো পায়ে হেঁটে যেতে
দেখেছি)

আশির রক্তাক্ত সময়ের আহত কবি বিষ্ণু বিশ্বাস। এরশাদের স্বৈরশাসনের থাবা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সমগ্র দেশের মানুষ তখন প্রাণপনে ডানা ঝাপটাচ্ছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের কলবমুক্ত হওয়ার জন্য ছিল আন্দোলনমুখর। আগুনমুখো এই সময়ে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র বিষ্ণুও নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন আশির উষ্ণ সময়ের উত্তাপকে। চোখের সামনে কবি দেখছেন মানুষ প্রগতির পথ ত্যাগ করে ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছে। যে পথ গিয়ে মিশেছে জঙ্গলে, মরণের সমস্ত উপাদান সেখানে সযত্নে রক্ষিত। জীবন-মৃত্যুর সংঘাতে সেখানে কেবলই উড়ছে আগ্নেয় স্রোতে বিচূর্ণ পাথরের ছাই। সমগ্র স্বদেশ আজ রক্তাক্ত। স্বদেশের এই রক্তাক্ত ছবি দেখে সে-দিনের এই তরুণ কবির প্রশ্ন—

> 'এখানে রক্ত। রক্ত রক্ত রক্তের দিঘি;
> কেউ চেনো কি, চেনে কেউ যারা মৃত, কেউ চেনো,
> চেনে কেউ, চেনো কি, কেউ চেনে?'[৩১] (ভোরের মন্দির)

কেবল বিষ্ণু বিশ্বাস নয় আশির অনেক কবির কবিতাতেই সামরিক শাসনে পিষ্ট মৃতপ্রায় স্বদেশের কথা উঠে এসেছে—

১) 'সত্যলোভী যতো শৃগাল-সন্ত
গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে জাগায় করোটি
ধূষর জীবাশ্ম করুণ ক্লিষ্ট
প্রত্নজীবনের চিহ্ন অবশেষ
জিভের লালারস জিভে নিঃশেষ'[৩২] (শবগাড়ি)

২) 'রক্তখেকো দানব আসে নগর পথে
ফুলের ঘ্রাণ আর আসে না আমার ঘরে
উদোম ঘরে একলা থাকি স্বপ্নবিহীন'[৩৩] (করতলে অবিশ্বাস)

৩) 'অতঃপর এই লাশ কাঁধে গোরস্থানের পথে হাঁটলাম
কবরে নামালাম তাকে এবং শেষবার দেখলাম
নিরীহ ফ্যাকাসে মুখখানি।

দাফন সম্পন্ন করে আমি ট্রেনে উঠি
দৈনিক পত্রিকা নিই
ক্রীড়া ও সাহিত্য পাতা পড়তে পড়তে
ঘরে ফিরে আসি।'[৩৪] (জন্মান্তর)

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম দুটি দশক এভাবেই কেটে যায় খুন, রক্ত, গুলি, বন্দুক, বুটের আওয়াজে। দেশভাগের আনন্দ দেশবাসী পাওয়ার আগেই দেশ চলে যায় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কদের হাতে। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম দুটি দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণি যাদের উৎপত্তি ও বিকাশ স্বাধীনতালাভের ঠিক পরে পরেই, তাদের সুবিধাবাদী মনোভাব গণতন্ত্রের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময় বাংলাদেশে যে-সমস্ত রাজনৈতিক দল ছিল তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত একটাই আদর্শের প্রশ্নে অবিচল ছিল তা হলো— পাকিস্তানি শাসন থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা। স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে কী কৌশল অবলম্বন করা উচিত হবে সেটা বোঝার মতো দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল না। ফলে রাজনৈতিক দলগুলির নির্দিষ্ট আদর্শ, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং বিজ্ঞানসম্মত কর্মপদ্ধতির অভাব সদ্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের গঠনমূলক উন্নয়নে কোনো সদর্থক ভূমিকা নিতে পারেনি।[৩৫] অতি অল্প সময়ে, মাত্র নয় মাসের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ায় ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে নেতৃত্বের আবেগ তাঁদের দুর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে সুবিধাবাদীগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ বিশেষ করে সেনাবাহিনী, রাষ্ট্রযন্ত্রকে কুক্ষীগত করা শুরু করে। সামরিক বাহিনীর এই কৌশল প্রকট রূপে দেখা দেয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর। সাতের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে পুরো আটের দশক জুড়েই সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পৃষ্ট হয়েছিল বাংলাদেশের জনগণ। গণতন্ত্রের এই বিনাশ দেশের মানুষের মনে যে গভীর শূন্যতা ও স্বপ্নভঙ্গ তৈরি করেছিল তার থেকে বাদ যায়নি সে-দেশের কবিতাও। ফলে দীর্ঘ এই দুই দশকে

বাংলাদেশের কবিরা যে-সমস্ত কবিতার রচনা করেছেন তার একটা বড়ো অংশ জুড়েই রয়েছে স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান।

২. রাজনীতি সচেতনতা

স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম দুই দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয় পর্বে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর একাধিক রাষ্ট্রপ্রধানের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এই অধ্যায়ের সূত্রপাতেই এই পরিস্থিতির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানেই আমরা বলেছি যে এই পরিস্থিতির ফলে দেশের মানুষের মনে যে প্রত্যাশাভঙ্গ ঘটেছিল তার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী আলোচনায় '১.' উপ-অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু এই স্বপ্নভঙ্গের ক্ষেত্রে মিশ্রিত হয়েছিল অনেকগুলি চিন্তনসূত্র। তার মধ্যে ছিল রাজনৈতিক সচেতনতা, আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় সম্পর্কে ক্ষোভ এবং এসবের পরেও যেহেতু মানুষ কোনোরকম আশাবাদ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, তাই সুসময়ের প্রত্যাশাও আছে। এখানে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতায় রাজনীতি-প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর প্রশাসনিক অস্থিরতা বাংলাদেশের মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। এই বিদ্রোহের আঁচ পাওয়া যায় হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়—

'আজকাল এমন সরস শ্যামলিমা কোথাও পাই না খুঁজে
যেদিকে ফেরাই চোখ বারুদের মতো খরতপ্ত মানুষেরা
গনগন করে। সমস্ত বাংলাই বুঝি
গরম বারুদ হয়ে গেছে ফের।'[৩৬] (বারুদ)

জনগণের ক্ষোভ, রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে সামরিক বাহিনীর একটি অংশ বঙ্গবন্ধুকে শাসন ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করে। এর ফলে ১৯৭৫ খ্রিস্টব্দের ১৫ অগাস্ট এক রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাত দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ফল বাংলাদেশের জনগণ অচিরেই বুঝতে পারেন। শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কার্যত

অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন বাংলাদেশের মানুষ। দেশ সম্পূর্ণভাবে সামরিক বাহিনীর অধীনে চলে যায়। এই সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে একাধিক কবিতা, যেখানে বঙ্গবন্ধুর অতীত অবদানের পাশাপাশি তাঁর হত্যাকারীদের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে তীব্র ব্যঙ্গ।

বাংলাদেশ তখনও গঠিত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ তখন বাংলাদেশ পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর। এই রকম পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ১৯৭০ সালের ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দেশের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে দেশের শাসন ক্ষমতা দখলের অন্যতম দাবিদার হয়ে ওঠে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা দেখালে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণে 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে গণ-আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি বলেন—''রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লা। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''[৩৭]। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার অভিপ্রায়ে এটিই ছিল প্রথম মুক্ত কণ্ঠস্বর। আর এই ঘটনাকে কবিতায় রূপ দান করেছেন একাধিক কবি—

১) 'শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'[৩৮] (স্বাধীনতা, এই শব্দটি

কীভাবে আমাদের হলো)

২) 'সেই মাঠে শুনি বজ্রকণ্ঠ, কী ঘোষণা, বীজ হলো বোনা
অকলা বৈশাখী সে কি, হাতে-হাতে উঁচু মুষ্টি-সমস্বর,
বাংলারগৃহ হলো দূর্গের প্রতীক, বাংলার মন
হলো সিঁদুরে ঈশান, হারানো সময় সূর্যমেঘ সোনা,
সন্ত্রাসের প্রান্তিক প্রহরে জ্যোতির্ময় তুমি শক্তিধর;
তারপর দৃশ্যান্তর, মুখের সমগ্র মুখ জনগণ।'[৩৯] (সাতই মার্চ একাত্তর)

৩) 'সাতই মার্চের জনসভা মানে জাতির জাতীয় জনসভা
দেশের সমস্ত মানুষের ঐক্য
সংকটের চরম মুহূর্তে স্থির অবিচল থাকা
এক কণ্ঠ থেকে সব কণ্ঠে অনুরণিত হওয়া—
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।।'[৪০] (জাতির জাতীয় জনসভা)

শেখ মুজিবুর রহমান সে-দিন কেবল সংগ্রামের ডাক দেননি, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে সমস্ত রকম সরকারি খাজনা দিতে নিষেধ করেছিলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান বর্জন করতে বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণায় পূর্ব-পাকিস্তানে প্রশাসনিক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই জটিলতা কাটাতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ থেকে ২৪ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খান একাধিকবার বৈঠক করেন। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ২৫ মার্চ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে ২৭ মার্চ বাংলাদেশে হরতাল পালন করা হবে। কিন্তু ঐদিন রাতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ঢাকার জনগণের উপর আক্রমণ করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম-পাকিস্তানের কারাগারে আটক করে। বঙ্গবন্ধুর এই গ্রেফতারির

ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবিদ আনোয়ার লিখেছেন 'প্রতিরোধ: ১৯৭১' কবিতাটি। যেখানে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন কবি—

'আমার নীলিমা ছিঁড়ে গেছে ক্রুর শকুনের চিৎকারে:
কবলিত চাঁদে বুটের প্রতাপ,
বেয়নেট-বেঁধা নিহত তারার শব পড়ে আছে বধ্যভূমিতে;
এখন হবে না কারো সাথে কোনো সন্ধি।'[৪১] (প্রতিরোধ: একাত্তর)

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু জেলের মধ্যেই ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি ভোরে বঙ্গবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পান। সেখান থেকে তিনি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখান থেকে ৯ জানুয়ারি তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১০ জানুয়ারি তিনি দিল্লিতে পৌঁছে ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। ঐদিন বিকেলে তিনি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ডাক দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সেদিনের মানুষের মনে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তা ধরা পড়েছে কামাল চৌধুরীর কবিতায়—

'তিনি আসলেন—মৃত্যুপুরী থেকে জেগে উঠল দেশ
মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল থেকে আতশবাজির মতো
ফুটতে থাকল উল্লাসের বুলেটবৃষ্টি
বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত প্রতিটি সড়ক
ভরে উঠল ভালোবাসার ফুলে
বাতাসে ধ্বনিত হলো 'স্বাগতম'-চতুর্দিকে উৎসব, চতুর্দিকে আনন্দ
চতুর্দিকে স্বাধীনতা।'[৪২] (১০ জানুয়ারি ১৯৭২)

জীবিত থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু কবিদের যতটা প্রভাবিত করেছিলেন, মারা যাওয়ার পর তাঁর প্রভাব ছিল পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। সে-কারণে মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক কবিতা। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট ভোরে কর্ণেল ফারুকের নেতৃত্বে ঘাতকদের একটি দল ধানমান্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আক্রমণ করে। এই

আক্রমণ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ বলেছেন—‘‘শেখ কামাল নিহত হওয়ার পর মহীউদ্দীন এবং তার সঙ্গীরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে মুজিবকে খুঁজতে থাকে প্রতিটা কক্ষে। শেষে তাঁর দেখা মিললো সামনের ব্যালকনিতে। সাহসের প্রতিমূর্তি মুজিব দাঁড়িয়ে আছেন প্রশান্তভাবে, হাতে পাইপ। ...শেষে যখন তাঁকে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে আরম্ভ করে, তখন তিনি চিৎকার করে বলেন, ‘তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?’ ওদিকে, মহিউদ্দীনকে এক পাশে সরতে বলে হুদা আর নূর স্টেনগান দিয়ে গুলি করে রাষ্ট্রপতির ওপর। ভোর পাঁচটা চল্লিশে মুখ থুবড়ে বঙ্গবন্ধু লুটিয়ে পড়েন সিঁড়িতেই। তখনো তাঁর হাতে ধরা পাইপ। কয়েকটা গুলি তাঁর বুকের ডান দিকে এবং পেটে লেগেছিলো। ফলে যখন সূর্য ওঠার কথা, সেই সূর্য ওঠার সময় ‘বঙ্গের গৌরব-রবি গেলা অস্তাচলে।’’[৪৩] হত্যাকাণ্ডের এই বর্ণনা শিল্পিত রূপ পেয়েছে একাধিক কবির কবিতায়—

১) ‘তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থাকল।
—কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামল না।
সিড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্ণেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।’[৪৪] (সেই রাত্রির কল্পকাহিনি)

২) ‘এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসারে
সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে—
স্বপ্নের স্বদেশ ব্যেপে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা ব’য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে!’[৪৫] (ইলেক্ট্রার গান)

৩) ‘সহসা দেখি আমার ছোট্ট ঘরখানির দীর্ঘ দেয়াল জুড়ে
দাঁড়িয়ে আছেন শেখ মুজিব;
গায়ে বাংলাদেশের মাটির ছোপ লাগানো পাঞ্জাবি
চোখে বাংলার জন্য সজল ব্যাকুলতা
এমনকি আকাশকেও আমি কখনো এমন গভীর ও জলভারানত
দেখিনি।’[৪৬] (টুঙ্গীপাড়া থেকে)

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের যে কোনো খবর পাননি এমন নয়। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য তিনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অসামান্য সাহস আর আত্মবিশ্বাস ছিল শেখ মুজিবের। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে তাঁর সন্তানতুল্য বাঙালিরা তাঁকে হত্যা করতে পারে। তাঁর এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল তাঁরই সেনাবাহিনীর অফিসাররা। এই হত্যাকারীদের ধিক্কার জানিয়ে শহীদ কাদরী বলেছেন—

‘বাঘ কিংবা ভালুকের মতো নয়
বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা হাঙরের দল নয়,
না। কোনো উপমায় তাদের গ্রেফতার করা যাবে না।
তাদের পরনে ছিল ইউনিফর্ম,
বুট সৈনিকের টুপী,
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাদের কথাও হয়েছিল,
তারা ব্যবহার করেছিল
একেবারে খাঁটি বাঙালির মতো,
বাংলা ভাষা। অস্বীকার করার উপায় নেই ওরা মানুষের মতো
দেখতে এবং ওরা মানুষই,
ওরা বাংলার মানুষ

-এর চেয়ে ভয়াবহ কথা আমি আর শুনবো না কোনোদিন।'[৪৭]

(হন্তারকের প্রতি)

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে গ্রিক পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কবি শামসুর রাহমান। গ্রিক পুরাণে মাইসিনির রাজা অ্যাগামেমনন এবং রাণী ক্লাইটেমনেস্ট্রা-এর অন্যতম কন্যা ছিল ইলেকট্রা। ট্রয় যুদ্ধে যাবার আগে রাজা তাঁর বড়ো মেয়ে ইফিগেনিয়াকে গ্রীক দেবী এথেনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই ঘটনায় রাণী ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইজিস্থস-এর সঙ্গে চক্রান্ত করে অ্যাগামেমননকে হত্যা করেন। কন্যা ইলেকট্রা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভাই ওরেস্টিজ-এর সঙ্গে পরিকল্পনা করে পিতার হত্যাকারীদের হত্যা করে।[৪৮] এই ঘটনাকে কবি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে কবিতায় রূপদান করেছেন—

'নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

আড়ালে বিলাপ করি একা-একা, ক্ষতার্ত পিতা
তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক কারাটাও অপরাধ।
এমনকি, হায়, আমার সকল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ; তোমার দুহিতা একি গুরুভার বয়!'[৪৯] (ইলেকট্রার গান)

পিতৃহারা ইলেকট্রার মতো কবিও জাতির পিতার এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শোক প্রকাশ করতেও পারছেন না। কারণ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাকে নিয়ে কবিতা লেখাটা ছিল দুঃসাহসিক কাজ। কেননা যাঁরা শেখ মুজিবুরকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন তাঁরা কখনই চাননি মৃত্যুর পরে বাংলাদেশের জনগণের ওপর তাঁর কোনো প্রভাব পড়ুক। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই কবি কবিতাটি লিখেছেন।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে (বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা এই সময় বাংলাদেশে না থাকায় এই ঘটনা থেকে রক্ষা পান)) হত্যা করা হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সে-দিনের ঘটনায় নিহত তাঁর পরিবারের সদস্যদের

ঢাকার বনানীতে কবরস্থ করা হলেও বঙ্গবন্ধুকে কবর দেওয়া হয় ঢাকা থেকে বহুদূরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। কারণ যাঁরা মুজিবকে হত্যা করেছিলেন তাঁদের আশঙ্কা ছিল জীবিত মুজিবুরের তুলনায় মৃত মুজিবুর রহমান হয়তো তাঁর ভক্ত, সমর্থকদের কাছে আরো বেশি অনুপ্রেরণার উৎস ও বিপ্লবের বার্তাবহ হয়ে উঠতে পারেন। ঘাতকদের এই আশঙ্কার কথা ধরা পড়েছে একাধিক কবিতায়—

১) 'যেখানে ঘুমিয়ে আছো, শুয়ে থাকো
বাঙালির মহান জনক
তোমার সৌরভ দাও, দাও শুধু প্রিয়কণ্ঠ
শৌর্য আর অমিত সাহস
টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামগুলো
তোমার সাহস নেবে
নেবে ফের বিপ্লবের দুরন্ত প্রেরণা।'[৫০] (বীরের এ রক্তস্রোত)

২) 'এখানে এই সবুজ নিভৃত গ্রামে, মাটির হৃদয়ে
দোয়েল-শ্যামার শিসে,
নিরিবিলি গাছের ছায়ায়
ঘুমায় একটি দেশ, জ্যোতির্ময় একটি মানুষ;
টুঙ্গিপাড়া মাতৃস্নেহে তাকে বুকে রাখে।'[৫১] (টুঙ্গিপাড়া)

টুঙ্গিপাড়ায় কবর দিলেও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বাংলাদেশের জনগণের মন থেকে বিস্মৃত হয়নি। তাই মৃত্যুর পরেও তাঁর গভীর প্রভাব বাংলাদেশের জনগণের ওপরে পড়েছিল। কারণ পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্তির পথে বাঙালিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' দাবি প্রণয়ন করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর অদৃশ্য প্রভাবেই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে ছিনিয়ে নিয়েছে স্বাধীন দেশ। মুজিবুর হয়েছেন জাতির পিতা।

ফলে তাঁকে হত্যা করে ক্ষমতা থেকে সরানো গেলেও বাংলাদেশের মানুষের মনে বঙ্গবন্ধু আজও জ্বলন্ত একটি নাম। প্রতিমুহূর্তে তিনি বাঙালির অন্তরে বিরাজমান। তাঁর এই প্রভাবের কথা উঠে এসেছে অনেক কবির কবিতায়—

১) ‘জনক মরতে পারে, কিন্তু তাঁর চেতনা মরে না
গুলি বোমা নির্বাসন এ-সবের তাৎপর্য ক্ষণিক’[৫২] (বীরের এ রক্তস্রোত)

২) ‘তুমি কি আসবে না তবু এই দগ্ধ ব্যথিত বাংলায়?
যদি বা না আসো বলো কোথায় থাকবে তুমি,
তোমার শরীর দেখি ছেয়ে আছে
এ দেশের প্রতি ইঞ্চি স্বপ্ন আর মাটি!’[৫৩] (তোমার অভাবে এই স্বাধীনতা)

বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট সপরিবারে (মুজিবুরের দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় তাঁরা বেঁচে যান) হত্যা করা হলেও তাঁর হত্যার কোনো বিচার হয়নি। এমনকি ওই হত্যাকাণ্ডের একুশ বছর পর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে দায়ের করা হয় হত্যা মামলা। কারণ মুজিবুরের হত্যাকারীরাই ছিলেন সে-দিনের বাংলাদেশের শাসক। সাধারণ মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মুখ খোলার সাহস অর্জন না করলেও, সে-দেশের কবিরা মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করে হত্যাকারীদের বিচার চেয়েছিলেন, গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন পাল্টা প্রতিরোধ। সেই ঘটনা উঠে এসেছে বহু কবিতায়—

১) ‘বাংলার যতো মজুর-কিষাণ
বলে বাংলার ব্যথাহত প্রাণ—
জেল হত্যার বিচার চাই
মুজিব হত্যার বিচার চাই।’[৫৪] (মুজিব হত্যার বিচার চাই)

২) ‘শোকের অশ্রু আজ পরিণত হোক শক্তিতে

পিতৃহত্যার প্রতিশোধে হে বাঙালি
আঘাত হানো খুনিদের ভিতে।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবের নাম ঘরে ঘরে
হোক মুক্তিমন্ত্র, হোক শক্তিশালী
বাঙালির কণ্ঠস্বরে।'[৫৫] (পিতৃহত্যার প্রতিশোধে)

৩) 'মানুষ মানুষকে খুন করে ঘৃণায়
খুন করে প্রায়শ্চিত্ত করে
আমার ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই
আমি হতভাগা
তোমার রক্তে রাঙানো হাতে পিতা কুষ্ঠ হোক, কুষ্ঠ হোক।'[৫৬] (পিতা)

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামো এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যকে অবাস্তব রূপকথা বলে মনে হয়। বাঙালি জাতি নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' গঠন করেছে। কিন্তু সেই দেশেই তাদের ন্যূনতম দাবি-দাওয়া অপূর্ণ থেকে গেছে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী রক্তাক্ত পট পরিবর্তনের পর বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশায় পর্যবসিত হয়। স্বপ্নভূমি থেকে জেগে ওঠা সোনার বাংলাদেশে নামে সূর্যাস্তের কালোছায়া। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র ফুটে উঠেছে একাধিক কবিতায়—

১) 'আমি যে দেশকে দেখি সে যে এই স্বপ্নভূমি থেকে উঠে আসা
আপাদমস্তক ছিন্নভিন্ন
সে যে আজো জয়নুলের দুর্ভিক্ষের কাক
আজো বায়ান্নর বিক্ষুব্ধ মিছিল
আজো আলুথালু, আজো দুঃখী
আজো ক্ষুণ্ন পদাবলী!'[৫৭] (আমার সোনার বাংলা)

২) ‘একদা একটি দেশ ছিল বাংলাদেশ নামে, সেই দেশে
মালা রূপান্তরিত হয় শেকলে এবং পিতা পরিণত
হয় ক্রীতদাসে—ইতিহাসের প্রতি পাতায়
রাজাকার তার নাম লেখে এবং সেলাই করে দেয়া
হয় দেশ প্রেমিকের চোখের পল্লব।’[৫৮] (একদা একটি দেশ ছিল)

৩) ‘সীমাবদ্ধ জলাশয়ে জীবনের নৌকো স্থির
স্বপ্নহীন চোখ—
মুজিবের চোখ নেই, তাই স্বপ্ন দেখা নেই
ঘুণ ধরা বাঁশের বেদনা নিয়ে বিপন্ন ঘরেতে
আজ বসবাস!’[৫৯] (জাতির জাতীয় জনসভায়)

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী রাজনীতিতে মোশতাক, সায়েম ক্ষণিকের জন্য ক্ষমতায় আসীন হলেও মূল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাতে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট আবু সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করে নিজের রাষ্ট্রপতির পদটি সুরক্ষিত করে নেন। মুজিব-প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান গঠিত হয়েছিল গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র—এই চারটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। ক্ষমতায় বসে জিয়াউর রহমান সংবিধানের সবকটি ভিত্তিকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করতে শুরু করেন। মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন মোশতাক। জিয়াউর রহমানও রাষ্ট্রপতি সায়েমকে তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তন্তর করতে বাধ্য করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূল স্তম্ভ। হিন্দু-মুসলমান নয় বাংলাদেশের জনগণ

মাত্রই বাঙালি। এই পরিচয়েই তাঁরা ভাষা-আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু জিয়াউর রহমানের সংশোধিত সংবিধানের সূচনাতেই বলা ছিল 'পরম করুণাময় আল্লাহয় পূর্ণ বিশ্বাস রেখে'।[৬০] এর ফলে অমুসলমান বিশেষ করে হিন্দুদের একমুহূর্তে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে তিনি জাতীয়তাবাদের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করার মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোটিকেও তিনি নষ্ট করেন। জিয়াউর রহমানের আমলে একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলেও তা সফল হয়নি। অবশেষে **১৯৮১** খ্রিস্টাব্দের **৩০** মে চট্টগ্রামে এক গণ-অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন। **১৯৭৫** থেকে **১৯৮১** পর্যন্ত যে অভ্যুত্থানগুলি ঘটেছিল সেগুলি দমন করতে গিয়ে জিয়াউর রহমান অগণিত খুন, গুপ্ত হত্যা করেন। রক্তাক্ত হতে শুরু করে বাংলাদেশের মাটি। এই অস্থির সময়ের অসুস্থ রাজনীতি, সন্ত্রাস, হানাহানি নিজের চোখে দেখেছেন সত্তরের তরুণ কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রতি নিশ্বাসেই তিনি লাশের গন্ধ অনুভব করেছেন, চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পেয়েছেন মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য। ধর্ষিতার কাতর চিৎকারে কবির ঘুম ভেঙে গেছে। কবি অনুভব করেছেন একাত্তরের পরাজিত শক্তিই আজ জিয়াউরের রহমানের বেশে আবির্ভূত। তাঁর এই ভাবনাই রূপ পেয়েছে কবিতায়—

> 'বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে,
> মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ।
> এই রক্তমাখা মাটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিলো,
> জীর্ণ জীবনের পুঁজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আঁধার।
> আজ তারা আলোহীন খাঁচা ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়।...
> জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন।'[৬১] (বাতাসে লাশের গন্ধ)

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে দেশে নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বি.এন.পি প্রার্থী আবদুস সাত্তার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২০ নভেম্বর আবদুস সাত্তার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু বি.এন.পি.র দলীয় পর্যায়ের বিশৃঙ্খলার জন্য ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর মন্ত্রীসভা বাতিল করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি আঠারো জন নতুন সদস্য নিয়ে তিনি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ২ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। এই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে ২৪ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বাতিল হয়ে যায় বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা ও সংসদ। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ হয়, ঢাকায় জারি হয় 'সান্ধ্য আইন'। পুনরায় অন্ধকার অধ্যায় শুরু হয় বাংলাদেশের জনগণের জীবনে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের সামরিক অভ্যুত্থানকে মানুষ মেনে নিয়েছিলেন কারণ এর পিছনে ছিল মুজিবের প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের সামরিক অভ্যুত্থানকে মানুষ ততটা সজহভাবে মেনে নেননি। কারণ দীর্ঘ সাত বছরের সামরিক শাসনের কুফল-কুপ্রভাবের সচেতন অভিজ্ঞান, সামরিক শাসনে একনায়কতন্ত্রের ভয়াল রূপ, মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ, ইত্যাদির কারণে আশির দশকের শুরু থেকেই ছাত্র-জনতা ক্ষুব্ধ ছিল। এরশাদের একনায়কতন্ত্রের করাল থাবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে ক্রমে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রাঙ্গণেও উপস্থিত হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর বাংলা একাডেমীতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সামরিক বাহিনী বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনা বুদ্ধিজীবীমহলে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ২৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বছরের শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। এই নীতির মূল কথা ছিল—প্রথম শ্রেণি থেকে আরবি এবং দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা, মাধ্যমিক শিক্ষাকে অতিরিক্ত দু বছরের জন্য প্রসারিত করা, মাধ্যমিক পরবর্তী স্নাতক শিক্ষার পূর্বে অতিরিক্ত একটি প্রাক-স্নাতক পর্ব প্রবর্তন, উচ্চশিক্ষার সুযোগ সংকোচন,

ছাত্রদের বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি। এই জনবিরোধী শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করেই ছাত্র আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। ২৯ নভেম্বর ঢাকা এবং ৩০ নভেম্বর সারাদেশে হরতাল পালন করে ছাত্র সংগঠনগুলি। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ গুরুতর হয়ে ওঠে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবেই শাসনের শুরুতেই এরশাদের স্বৈরাচারী রূপটি জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়। তারই বাক্যরূপ দান করে নির্মলেন্দু গুণ লেখেন—

‘সংবিধান স্থগিত রেখে, গণপরিষদকে বাতিল ঘোষণা করে
আপনি যখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ করেন
তখন মধ্যরাত। চতুর্দিকে চিক্‌চিক্ করছে অন্ধকার।
আপনার পরিচয় তখনও অস্পষ্ট।...
আপনার পূর্বসূরীর মতই আপনি বললেন :
স্বেচ্ছাকণ্টকিত গণতন্ত্রের পথ কণ্টকমুক্ত করেই
আপনি ফিরে যাবেন ব্যারাকে;...
কিন্তু আপনার মুখোশ খসিয়ে দিতে শুরু করলো সময়।
আপনার দুর্নীতিবিরোধী অভিযান রূপান্তরিত হলো
দল ভেঙে নিজস্ব দল গড়ার এক মোক্ষম হাতিয়ারে।
করবে শায়িত মৃত, পরিত্যক্ত শিক্ষানীতিকে
পাকিস্তানের বাতিল বাসকেট থেকে তুলে আনলেন আপনি।
ছাত্ররা বিদ্রোহ করলো। প্রতিবাদ মুখর হলো বুদ্ধিজীবীরা।
আপনি তাদের দমন করলেন হিটলারি কায়দায়।’[৬২] (একটি পুরনো কবিতা)

অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের জন্য এরশাদ সর্বদাই নিজের ক্ষমতার ক্ষেত্রটিকে মসৃণ রাখতে তৎপর ছিলেন। সে-জন্য যেকোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে শুরুতেই বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তাঁর ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি ছিল চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দেশে কোনো জরুরি অবস্থা ছিল

না। রাষ্ট্রপতি নিজে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এরশাদ, সাত্তারকে পদচ্যুত করেন। গণতন্ত্রকে চিরতরে নির্বাসিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যে আইন প্রশাসক হিসাবে এরশাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভেঙে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোহরে চারটি হাইকোর্ট স্থাপন করেন। সর্ব্বোচ্চ আদালতকে ভেঙে ফেলা গণতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করার সমতুল্য। এরশাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা সরব হলে অক্টোবর মাসে তেরোজন আইনজীবীকে গ্রেফতার করা হয়। এর পর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য থানাগুলিকে উন্নীত করে উপজেলায় পরিণত করা হয়। এইভাবে এরশাদ সামরিক শক্তির সাহায্যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে শুরুতেই বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হন। এরশাদের এই গণতন্ত্র-বিরোধী মুখোশটি উঠে এসেছে জাহিদ হায়দারের কবিতায়। যেখানে গণতন্ত্রকে তিনি তুলনা করেছেন 'কবি'র রূপকে—

'নগরের দ্বার থেকে কবিকে দাও বিদায়
প্রবেশ নিষেধ,
ক'জন মানুষ দিনরাত খুলে রাখে চোখের আকাশ
সর্বদা সতর্ক ব্যস্ত পাহারায়।'[৬৩] (কবির প্রবেশ নিষেধ)

এরশাদ তাঁর শাসনকালে যে-সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মধ্যে ছাত্র আন্দোলন ছিল অন্যতম। এমনকি এরশাদের পতন নব্বইয়ের যে গণ-অভ্যুত্থানে হয়েছিল, তার সূচনাও হয়েছিল ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর থেকেই। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্যালেস্টাইন সংহতি দিবসে সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে প্রথম প্রতিবাদী মিছিল করে ছাত্রসমাজ। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে ছাত্ররা মিছিল করলে তাদের ওপর হামলা চালায় সেনাবাহিনীর একটি অংশ। অসংখ্য ছাত্রকে কারাগারে আটক করা হয়। কিন্তু এই ঘটনায় ছাত্র আন্দোলনে কোনো ছেদ পড়েনি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭ সেপ্টেম্বর। ঐদিন শিক্ষা-দিবস পালনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী এরশাদ-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন একটা নতুন মাত্রা লাভ

করে। অন্ধকার সময়ে দাঁড়িয়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ছাত্রসমাজের এই দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে শিহাব সরকারের কবিতায়—

'আলোর সন্ধান করো, আলোর সন্ধান করো
বলতে বলতে কারা যেন ছুটে গেলো
ওরা নিশ্চিত নবীন কিশোর, ওদের জন্য এখনি আলো চাই
অন্ধকারে যে-দৃশ্য দেখে ওরা আর্তনাদ করে
তা সময়ের ধ্রুব সত্য হয়ে আছে'[৬৪] (অন্ধকার)

আশির দশকে ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিল রাউফুন বসুনিয়া। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি শিক্ষাভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। এই মিছিলের অন্যতম নেতৃত্বে ছিল বসুনিয়া। এমনকি ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ছাত্রদের সচিবালয় ঘেরাও, ২৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে ট্রাক তোলার দিন সবক্ষেত্রেই বসুনিয়া ছিল আন্দোলনের অগ্রভাগে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা-দিবস পালনের জন্য সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে সূর্যসেন হলে মিছিল করার সময় গুলিতে নিহত হন ছাত্রনেতা বসুনিয়া। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুভব করে কবি মোহন রায়হান বলেছেন—

'মধুর কেন্টিনে যাই
প্রতিদিন জীবন হাতের মুঠোয়
প্রতিদিন হামলা রুখতে হয়
বসু, আজ সেই প্রতিরোধের সারিতে তুমি নেই
আজ বড়ই অভাব অনুভব করছি তোমার।'[৬৫] (বসু তোমাকে মনে পড়ে যায়)

এই সময় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এরশাদ নিয়মিত কবিতা লেখা শুরু করেন। নিজের গণতন্ত্র-বিরোধী মুখোশটিকে আড়াল করার জন্যই এরশাদ কবির ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। নিজেকে সংস্কৃতি জগতে স্মরণীয়

রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ছদ্মবেশে ভোলেননি দেশের কবিরা। বরং তীব্র আক্রমণ করেছেন এরশাদকে। তাঁর এই ব্যর্থ কাব্যপ্রয়াসকে ব্যঙ্গ করে কবিরা লিখেছেন একাধিক কবিতা—

১) 'সব শালা কবি হবে; পিঁপড়ে গোঁ ধরেছে, উড়বেই;
বন থেকে দাঁতাল শুয়োর রাজাসনে বসবেই।'[৬৬] (খোলা কবিতা)

২) 'এরই মধ্যে সহসা একদিন
কবিতার পুচ্ছ ধরে আপনি এসে আসন পাতলেন
আমাদের শ্রেষ্ঠ-কবিদের শীর্ষে।'[৬৭] (একটি পুরনো কবিতা)

৩) 'কবিতা লিখছেন স্বৈর সরকার, আমলা, রাজাকার, সমরবিদ
কবিতা লিখছেন জাতীয় তস্কর, ঠগ ও জোচ্চর, ফেরেব্বাজ'[৬৮] (আশির দশক)

কবিদের এই ক্ষোভের নেপথ্যে রয়েছে এরশাদের বেশ বদলের প্রচেষ্টা। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে এরশাদ সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জনগণের আস্থা অর্জন করার জন্য তিনি দুর্নীতির অভিযোগে সাত্তারের মন্ত্রীসভার করেকজনকে গ্রেফতার করেন। একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের শাসনক্ষমতা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের মোহভঙ্গ ঘটে। এরশাদের আপাত শান্ত চেহারার মধ্যেই জনগণ উদ্যত রাইফেল হাতে এক সৈন্যকে প্রত্যক্ষ করেন। লোলুপ দুর্নীতিবাজদের চক্রান্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে বাংলাদেশের সমাজকাঠামো, রক্তাক্ত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রসারিত হতে শুরু করে পুঁজিবাদের কালো থাবা। জনগণের সামনে নিজের কলঙ্কিত শাসনকে চাপা দিতে সংবাদ মাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা রাজি করা শুরু করেন এরশাদ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল 'সাপ্তাহিক খবর' এবং 'সোনার বাংলা'কে নিষিদ্ধ করা হয়। ৮ জুন ঢাকার উপর থেকে দীর্ঘ আট বছরের

কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু এটি ছিল এরশাদের চক্রান্তেরই একটি কৌশল। এরপরেও ধারাবাহিকভাবে ছাত্র-রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন চলতে থাকে। ২৮ নভেম্বর কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অবস্থান ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ঢাকায় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ হলে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ হয়, 'সান্ধ্য আইন' জারি হয় ঢাকায়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা সংহতি মিছিল বের করে। কিন্তু এরশাদের নির্দেশে ছাত্র মিছিলের ওপর ট্রাক তুলে দেয় সামরিক বাহিনী। নিহত হয় দুজন ছাত্রনেতা সেলিম ও দেলোয়ার। এই ঘৃণ্য ঘটনা উঠে এসেছে বিমল গুহের কবিতায়—

'সেইদিন শহরময় সারিবদ্ধ তরুণ ও সারিবদ্ধ ট্রাক
গণতন্ত্রের লিফলেট বহন করে
সমান্তরাল হেঁটেছে রাস্তায়,
পাগলা কুকুর যেমন হাওয়া বোঝে না-
সেরকম পিফলেট বোঝাই ট্রাক একসময়
হা-হা করে জনতার মধ্যে ছুটে গেলো,

রক্তে আর লিফলেট একাকার হলো রাজপথ।'[৬৯] (লিফলেট বোঝাই ট্রাক)

তবে এই হত্যাকাণ্ডকে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন কবি ফরহাদ মজহার। এরশাদের শাসনকালে সবথেকে বেশি অত্যাচারিত হয়েছে ছাত্রসমাজ। কারণ সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন অংশ হিসাবে ছাত্ররাই সবথেকে বেশি বিরোধিতা করেছে এরশাদ সরকারের জনবিরোধী নীতির। এরশাদের আমলেই শিক্ষার মান একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল। সংকুচিত হয়েছিল উচ্চশিক্ষার সুযোগ। সে-কারণে ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলেই আশির দশকের অধিকাংশ সময় ধ্বনিত হয়েছে। তাই ছাত্র মিছিলে এরশাদ ট্রাক তুলে দিলেও কবি মনে করেন এটা ছাত্র সমাজেরই জয়, এরশাদের পতনের সূচনা—

'ট্রাক তুমি কোত্থেকে এবং এতো আকস্মিক কেন?

তবে কি মানুষের মিছিল তোমাকে অতিক্রম করে আসতে পেরেছে?
তোমাকে পেছনে ফেলে সত্যি সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছে মিছিল?
সত্যি সত্যিই?
ট্রাক?
ইতিহাসের ময়লা বহনকারী
শেষতম পরিবহন সংস্থার ট্রাক?'[৭০] (লেফটেনান্ট জেনারেল ট্রাক)

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-বন্দিদের মুক্তির দাবিতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় জড়ো হয়। বটতলা থেকে ছাত্রদের মিছিল শিক্ষাভবনের সামনে এলে পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের ওপর গুলি চালায়। এই ঘটনায় একাধিক ছাত্র নিহত হয়। এরপর পুলিশ শিশু একাডেমীতে ঢুকে কিশোর ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবকদের ওপর অত্যাচার চালায়। বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ছাত্রদের পক্ষ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি মৌন মিছিল এবং ২০ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়।[৭১] পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে জগন্নাথ কলেজ, তিতুমীর কলেজ, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং বিভিন্ন ছাত্রবাসে হামলা চালায়। অসংখ্য ছাত্রদের গ্রেফতার করার পাশাপাশি অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমগ্র দেশ দুঃস্বপ্নের নগরীতে পরিণত হয়। এই দমবন্ধ পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে মুজিবুল হক কবীরের কবিতায়—

'চাদ্দিকে চলে দলন
দমন
পীড়ন
এবং সংঘাত।
প্রতিটি শহরে কারফিউ, ব্যারিকেড। মানুষের রক্তাক্ত

হৃদয়ের সঙ্গে দিন ও রাত কাতরায়।'[৭২] (বারুদের গন্ধ আসে)

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ এরশাদ ঘোষণা করেন যে আগামী ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশের তৃতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এমনকি একজন প্রার্থী একসঙ্গে পাঁচটির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বলে আদেশনামাও সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা হয়। এরশাদের এই একপাক্ষিক সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলি নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির আহ্বানে ৭ মে নির্বাচনের দিন স্থির হলে এবং সরকারের পক্ষ থেকে অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আশ্বাস পেয়ে, বিরোধী দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সময় বিরোধীদের এই নির্বাচনে জয়লাভের একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর গণতান্ত্রিক পরিবেশের যে বিলোপ ঘটেছিল তা পুনরায় ফিরে আসবে এই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন বাংলাদেশের মানুষ। এই স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে নির্মলেন্দু গুণের কবিতায়—

'১৯৭৫-এ হারিয়েছি আমার প্রতীক, শৌর্য-বীর্যধারা, অন্ধকারে।
তারপর থেকে ভিতরে ভিতরে একা, গৃহহারা। স্বপ্নহীন ক্ষোভে
বসে থেকে থেকে ঘুমে ঘুমে, আত্মগোপন গোপনে ক্লান্ত।
একটা কিছুকেই উপলক্ষ করে আবার দাঁড়াতে চাই;
বাংলার মাটি বাংলার জল আমাকে কি নেবে?'[৭৩] (রাজদণ্ড)

কবির সংশয় ছিল বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফেরা নিয়ে। বলাবাহুল্য কবির এই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। বিরোধীদের কাছ থেকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েই এরশাদ তাঁর ক্ষমতালোভী মুখোশটি উন্মোচিত করেন। ২৯ এপ্রিল থেকে নির্বাচন-বিরোধী কর্মসূচি নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ এরশাদ যেকোনো মূল্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি যে এই নির্বাচনে জয়লাভ করবেন সে সম্বন্ধে তিনি আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলেন। ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি হিসাবে এরশাদ নির্বাচিত হন। ২৩ অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এরশাদের

এই জয় বাংলাদেশের মানুষের মনে হতাশার জন্ম দিয়েছিল। চোখের সামনে জনগণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হতে দেখেছেন বারবার। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের যাপনচিত্রের পরিবর্তন একবারের জন্যও হয়নি। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে এরশাদের পতন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন অবাধ না হওয়ায় তিনি পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই ঘটনায় তীব্র হতাশা ব্যক্ত করেছেন কবি ময়ুখ চৌধুরী। চোখের সামনে তিনি রক্তে রঞ্জিত হতে দেখেছেন বাংলাদেশের পতাকা, বিক্রি হতে দেখেছেন গণতন্ত্রকে। তাই বিকিয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে আপস করে কবি বেঁচে থাকতে চান না। শেষবারের মতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি গণতন্ত্রকে ফেরাতে চেয়েছেন—

'অগ্নিপরীক্ষার তবু শেষ হয়নি,
কারা যেন শকুনের মতো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে
দশ কোটি হৃৎপিণ্ড আর অধিকার।
এইসব শকুনের সঙ্গে গণতন্ত্র ভাগাভাগি করে
বেঁচে থাকা হবে না আমার।

আমি ঢুকে পড়েছি বন্দুকের নলের মধ্যে
আরেক জন্মের জন্যে।'[৭৪] (জন্মান্তর)

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে পতনের প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশকে সামরিক শাসনে আবদ্ধ রেখেছিলেন এরশাদ। কিন্তু ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের পর তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ক্ষমতা দখলের সময় তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যা ছিল অনৈতিক ও আইনবিরুদ্ধ। জিয়াউর রহমানের মতো এরশাদও সামরিক বাহিনীকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে, সামরিক শক্তিতে দেশ শাসন করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করেছেন, বিচারব্যবস্থাকে নিজের কুক্ষীগত করে জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার পরিবর্তে সামরিক শাসক হিসাবে কর্তৃত্ব করেছেন। তাঁর

আমলেই রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাজনীতিবিদদের হাত থেকে আমলাদের হাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় সমগ্র দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ শাসিত হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্বহীন অবস্থায় সামরিক শাসনের অধীনে। ফলে এক দশক জুড়ে জনগণের চাওয়া-পাওয়া যেমন উপেক্ষিত হয়েছে তেমনি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশও সমান্তরালভাবে ব্যাহত হয়েছে। সামরিক শাসনের উত্থান এবং বিকাশ এমনই ছিল যে জনগণ একাধিকবার আত্মদানের মধ্যে দিয়ে চাইলেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। সামরিক শাসনের এই ভয়াল কুটিল রূপকে প্রত্যক্ষ করে শাসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে কবি হামিদুল হক মুন্সী বলেছেন—

> 'যে তুমি হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে চাও
> মানুষের মানচিত্র, সুখ ও শান্তির চাবি
> যে তুমি বিদ্যুতের আলো রাখো নিজের পকেটে
> চাঁদের আলোকে রাখতে চাও আপন করে
> অন্ধকারে গাউন পরাতে চাও পৃথিবীর শরীরে
> সেই তোমার নাম স্বৈরাচার।'[৭৫] (স্বৈরাচার)

বাংলাদেশের একাধিক কবির কবিতায় এরশাদের এই স্বৈরাচারী প্রতিমূর্তিটি প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে ক্ষোভের সঙ্গে মিশে গেছে কবিদের আত্মযন্ত্রণাও—

১) 'নষ্ট দ্রাঘিমায় এসে গেছি হে দেবদূত!
অস্থিতে মজ্জায় হিম জমে আছে অজস্র কর্দম
কী করতে কী করে ফেলি বুঝি না পূর্বাপর
কেঁচো খুঁড়ে অজগর!'[৭৬] (স্বগতোক্তি)

২) 'মুখ থুবড়ে সভ্যতার লাশ—
ফাঁদে রুগ্ন ছটফট বিধ্বস্ত আকাশ
মেঘের কিনারে সূর্য ম্রিয়-মুখ

পাখিরা নীরব স্বপ্নে—
ক্লিষ্ট রাতে আনাড়ির অট্টরব
বিষধর সাপের ছোবলে
বেহুলা হারায়ে পতি
কোথাও চলেছে তরী একা-একা'[৭৭] (দাগ)

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিরা 'বাংলাদেশ' নামক ভূখণ্ডকে পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে পৃথক করে নিজেদের স্বপ্নের বাসভূমি গড়ে তুলতে চেয়েছিল। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি শাসনের বঞ্চনার পর এই ভূখণ্ডের মানুষ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। দেশবাসী ভেবেছিলেন পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও নির্যাতনের অবসান হবে, নির্মিত হবে শোষণমুক্ত সমাজ। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার প্রতিটি পদক্ষেপে ধাক্কা খেতে শুরু করে দেশবাসীর স্বপ্ন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে অবসান ঘটে গণতান্ত্রিক সরকারের। সূচিত হয় সামরিক স্বৈরশাসনের নতুন অধ্যায়। এর পর দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশ ছিল স্বৈরশাসনের কালো মেঘে ঢাকা। সামরিক সরকার দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার ফলে জনগণের স্বপ্ন দুঃশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে, আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নের বধ্যভূমিতে। সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি নাসির আহমেদ স্বৈরশাসকদের শুনিয়েছেন সতর্কবাণী—

'নব্য ইতিহাস যারা লিখছে আশ্চর্য ঐক্যে আজ প্রিয়তমা
মানুষ তো বটে, শোনো, বাংলার নিসর্গও করবে না ক্ষমা
অটল ক্ষিপ্রতাসহ স্যালুটে উদ্যত ওই ঝাঁক ঝাঁক হাত
তারাও বিস্মৃত আজ রক্তাক্ত দিনের স্মৃতি!
হায় পোড়া দেশ তোর এমনই বরাত!'[৭৮] (হায় পোড়া দেশ)

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সংসদ নির্বাচনের পর ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ জুলাই শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-এর ধর্মঘট পালিত হয়। সংসদে জেলা পরিষদ বিল নিয়ে মধ্য জুলাইয়ে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১০ নভেম্বর। ঐদিন চব্বিশ বছরের যুবক নূর হোসেন বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' আর 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে মিছিলে হাঁটার সময় পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়। গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে বুকে-পিঠে পোস্টার আঁকা প্রতিবাদী যুবক নূর হোসেন অচিরেই পরিচিতি পেয়ে যায়। নূর হোসেনের মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মী, নেতা, কবি, কলেখকসহ একাধিক মানুষকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। সে-বছরই শামসুর রাহমান নূর হোসেনকে কেন্দ্র করে দুটি কবিতা লিখেছিলেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে 'সাপ্তাহিক একতা'র বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' এবং 'সাপ্তাহিক দেশবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'একজন শহীদের মা বলছেন' কবিতাদুটি।[৭৯] ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর 'সাপ্তাহিক একতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শামসুর রাহমানের 'আলো-ঝরানো ডানা' কবিতাটি। একজন প্রতিবাদী যুবককে কেন্দ্র করে একজন কবির একাধিক কবিতা রচনা একথাই প্রমাণ করে আশির দশকের শেষভাগে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে শহিদ নূর হোসেন হয়ে উঠেছিল অন্যতম চালিকা শক্তি। তার বুকে লেখা দাবিই সমগ্র বাংলাদেশের দাবিতে পরিণত হয়েছিল। তাই 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কবিতায় নূর হোসেন হয়ে উঠেছে বিপ্লবের প্রতীক—

> 'উদোম শরীর নেমে আসে রাজপথে, বুকে পিঠে
> রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান,
> বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
> শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
> নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
> ফুটো ক'রে দেয়; বাংলাদেশ
> বনপোড়া হরিণীর মতো আর্তনাদ করে, তার

বুক থেকে অবিরল রক্ত ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে।'[৮০] (বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়)

রাজনৈতিক কবিতায় প্রায়শই নির্দিষ্ট ব্যক্তিনাম বা স্থাননাম ব্যবহার করেন কবিরা। তার কারণ রাজনৈতিক কবিতা বিশেষভাবে একটি রাজ্যের বা রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা এবং পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়। বাহান্নর অভ্যুত্থানের সময় বরকত, রফিক, জব্বার-এর মতো ব্যক্তিনামগুলি কবিতায় বারবার স্থান পেয়েছে। সে-রকম এই কবিতায় এসেছে নূর হোসেনের নাম। নূর হোসেন-এর মতো সাহসী যুবকের আত্মত্যাগ সেদিনের সংগ্রামী বাংলাদেশের মানুষের অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বৈরাচারী শাসকের বুলেটই ব্যক্তি-পরিচয়কে কাটিয়ে নূর হোসেনকে সর্বজনীন করে তুলেছিল। কারণ তার কাছে জন্মদাত্রী মা এবং জন্মভূমি বাংলাদেশ সমান প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। এই ভাবনাই ফুটে উঠেছে 'একজন শহীদের মা বলছেন' কবিতায় নূর হোসেনের মাতৃরূপিণী শামসুরের কলমে। কবি আশাবাদী নূর হোসেনের এই আত্মত্যাগের উর্বর মাটিতে ভবিষ্যতের স্বপ্নময় শস্য ভরা বাংলাদেশ গঠিত হবে। গণতন্ত্রের মুক্তি চাইতে গিয়েই সে আজ 'জীবনের সাজ-পরা কিংবদন্তি' হয়ে গেছে। কিন্তু নূর হোসেনের নাম ব্যবহার করে ভবিষ্যতের রাজনীতির কারবারিরা যদি নিজেদের আখের গোছাতে তৎপর হয় তার পরিণতি যে ভয়ানক হবে সে কথাও জানাতে ভোলেননি কবি—

'হয়তো ভবিষ্যতে অনেকেই
তার কথা বলে দিব্যি মাতাবে শ্রোতার ভিড় আর
করবে এমন কেউ কেউ উচ্চারণ

ওর নাম, হোমরা-চোমরা তারা, যারা
তার কথা বলছে শুনলে সে আবার অকস্মাৎ
জিন্দা হয়ে পতাকার মতো হাত তুলে
জনসভা পণ্ড করেজানাবে তুমুল প্রতিবাদ,

ওদের মুখোশ-আটা ভণ্ড মুখে দেবে ছুড়ে থুথু, শুধু থুথু।'[৮১] (একজন শহীদের মা বলছেন)

কেবল শামসুর রাহমান নয় বাংলাদেশের একাধিক কবির কবিতায় নূর হোসেন হয়ে উঠেছে অনুপ্রেরণা, বিদ্রোহের বার্তাহব। কবি নির্মলেন্দু গুণ 'নূর হোসেন' কবিতায় নূর হোসেনের কৃতিত্ব বর্ণনায় অতীত ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। অতীতের চিত্রকররা সচেতনভাবেই তাঁদের শিল্পকর্মকে গুহার দেওয়ালে অঙ্কন করেছিলেন নিজের সৃষ্টিকে অমরত্ব দান করতে। কিন্তু সে-রকম কোনো সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে নূর হোসেন মিছিল করেনি। কিন্তু তার এই আত্মত্যাগ ম্লান করে দিয়েছে চিত্রকরদের অতীত কীর্তিকে। কবি মনে করেন এই নূর হোসেনই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতীক—

'অবাক হবো না যদি অতঃপর বঙ্গজননীর
গর্ভে যারা জন্ম নেবে তাদের বুকে ও পিঠে:
'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।'
এই বাণী উৎকীর্ণ থাকে উজ্জ্বল হরফে।'[৮২] (নূর হোসেন)

মহাদেব সাহা তাঁর 'এই কবিতার নাম নূর হোসেন' কবিতায় শহিদ নূর হোসেনকে সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যে কবিতা লেখা হয়েছিল ঢাকার উন্মুক্ত রাজপথে রক্ত আর ভালোবাসার উষ্ণতায়। বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত নূর হোসেনই কবির কাছে জীবন্ত পাণ্ডুলিপি। নূর হোসেনই বাংলাদেশের জনগণের জীবনের সেই গোলাপ যে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাতে প্রস্ফুটিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথে। কিন্তু শাসকের রক্তচক্ষু তার আস্ফালনকে মানতে পারেনি। বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার শরীর। মুহূর্তেই ইতিহাস হয়ে গেছে নূর হোসেন। কবি সেই জীবন্ত ইতিহাসের সাক্ষী—

'আমি যদি আজ একালের কোনো সুবিখ্যাত ইতিহাসের কথা বলি,
তা'হলে সেই ইতিহাসের নাম নূর হোসেন
আহা নূর হোসেন এই ইতিহাসের অমর অধ্যায়,

নিজের বুকেই সে ঝুলিয়েছিলো সবচেয়ে সাহসী ব্যানার
করেছিলো খোদাই নিজের বুকে রাত জেগে বিদ্রোহী কবিতা।'[৮৩] (এই কবিতার নাম নূর হোসেন)

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনে প্রাণ দিতে হয়েছিল নূর হোসেনকে সেই আন্দোলনই ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। জনগণের জাগরণে এরশাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। নতুন করে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন মানুষ। যে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল নূর হোসেন। তাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কবি আবুবকর সিদ্দিক-এর চেতনা জুড়ে কেবলই নূর হোসেনের উপস্থিতি—

'জনতা এনেছে নব্বইয়ে নব স্বাধীনতা,
রাজপথে ঢল জংগী জনতা গণজোয়ার,
অশ্রুহাসিতে শোণিতেকুসুমে মাখামাখি।...
নূর হোসেন! নূর হোসেন! নূর হোসেন!
ধার দিতে থাকো শাণিত চেতনা ইস্পাতে,
আবার লড়াই ডাক দিয়ে যাবে অবধারিত।'[৮৪] (নব্বইয়ের স্বাধীনতা)

এছাড়াও বাংলাদেশের অনেক কবির কবিতাতে নূর হোসেন এসেছে কখনও বিপ্লবের প্রতীকরূপে, কখনও-বা জাতির পতাকারূপে, হয়ে উঠেছে বাঙালির অমর ভাস্কর্য—

১) 'গণতন্ত্র মুক্তি পাবে বলে,
সভ্যতার কৃত্রিম পোশাক ছুঁড়ে ফেলে
বুক পেতে দিয়েছিলে ক্ষুধাতুর জলপাই রঙের সম্মুখে;
কঠিন দাঁড়িয়েছিলো স্বৈরাচারী চারপায়া ভ্যান।
সংসদে যাবে না নূর হোসেন?'[৮৫] (নূর হোসেন)

২) 'গোলাপ ফোটাতে গিয়ে
হয়ে উঠলে গোলাপেরও চেয়ে মহত্তর

আগুন নেভাতে গিয়ে
হয়ে উঠলে অবিনাশি অতৃপ্ত আগুন,
সে আগুন আরোও ক্ষুধিত ক্ষুব্ধ
ব্যাপ্ত হয়ে আমাদের বুকে জেগে আছে।'[৮৬] (নূর হোসেন)

৩) 'ঐ পতাকায় তাকিয়ে দেখি আমার মায়ের
শ্যামলা মুখ
আমার মায়ের আরেক নাম বাংলাদেশ
আমার নিজের আরেক নাম নূর হোসেন।'[৮৭] (নূর হোসেন)

৪) 'রঁদা ও হেনরী মূর
তোমার চৈতন্য থেকে আছেন সুদূর,
অথচ হে নূর হোসেন, তোমার তুলনা কোনো জাদুঘরে নেই!
তুমি বাঙালির অমর ভাস্কর্য নাকি ভাস্কর্য নিজেই!'[৮৮] (শহীদ নূর হোসেন)

৫) 'আর কালো রাজপথে রক্তে এঁকে দিলে
সুদৃঢ় গণতন্ত্রের বিজয়ী আলপনা।
আর এদিকে মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে
মিছিলের মতোই দীর্ঘতর হচ্ছে তোমার স্বপ্ন
মিছিলের মতোই দীর্ঘতর।'[৮৯] (মিছিলের মতো দীর্ঘতর নূর হোসেন)

৬) 'মিছিল আসুক ফের এই দেশে
মিছিল আসুক,

ডাকে ওই নূর হোসেন, ডাকে তার
রক্তমাখা বুক।'[৯০] (একটি মিছিলের প্রতীক্ষা)

৭) 'বৃক্ষ যেমন পারে
তেমনি মানুষও পারে জনমের মহিমা বিলাতে,
নূর হোসেন—এই নাম যৌবনের প্রতীক এখন
দুই চোখে জ্বলজ্বল আগামী দিনের সূর্যোদয়
বিশাল বুকের মাঝে প্রজ্বলিত যৌবনের ফুল।'[৯১] (নূর হোসেন)

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শহিদ ছাত্রদের নাম আমাদের কাছে বহুশ্রুত। সেই তুলনায় নূর হোসেনের নাম বাংলাদেশের বাইরে খুব বেশি পরিচিত নয়। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে নূর হোসেনের সংগ্রাম ও আত্মদান যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা এই কবিতাগুচ্ছ থেকে বোঝা যায়।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর থেকে ছাত্রদের একের পর এক আন্দোলন সরকারকে চরম সংকটের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে গেলে পুলিশ সমবেত জনতর ওপর গুলিবর্ষণ করে। এই ঘটনায় একুশ জন নাগরিক নিহত হয়।[৯২] সারাদেশে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু বিরোধী দলগুলির ঐক্যের অভাবে তেমন কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলন সংঘটিত হতে পারেনি। ফলে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক দল বা ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে তেমন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ছাত্র আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়। ১০ অক্টোবর ছাত্রদের অবস্থান কর্মসূচিতে গুলি চালালে জেহাদসহ একাধিক ছাত্র নিহত হয়। জেহাদের লাশকে সামনে রেখে সরকার-বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে নতুন ঐক্য সূচিত হয়। চব্বিশটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গড়ে ওঠে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য'। শুরু হয় লাগাতার আন্দোলন। ১৩ ও ১৪ অক্টোবর ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট চলাকালীন ১৪

অক্টোবর জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে অর্ধ-শতাধিক ছাত্র আহত হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে সংঘর্ষে সাতজন আহত হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ-দিবস পালিত হয়। ১৬ অক্টোবর আট, সাত ও পাঁচ দলের ডাকে সমগ্র দেশে অর্ধ-দিবস ঘর্মঘট পালিত হয়। শেখ হাসিনা এরশাদের পতন, সংসদ বাতিল, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের ডাক দেন।[৯৩] এর পর সমগ্র নভেম্বর মাস জুড়ে ছাত্র ও রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে একাধিক মানুষ নিহত হন। ২৮ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে এক আহত ছাত্রনেতা নিহত হলে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয়। ছাত্ররা কমিশনারের অফিস ঘেরাও করে, জেলাশাসককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এতকিছুর পরেও এরশাদ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে প্রবলভাবে তৎপর হন। জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন একইদিনে করার প্রতিশ্রুতি দেন। এমনকি মনোনয়ন দাখিলের পনেরো দিন আগে তিনি পদত্যাগ করবেন বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু জনগণ তাঁর এই বক্তব্যকে গ্রহণ করেননি। জনগণের এই অবিশ্বাসের নেপথ্যে রয়েছে এরশাদের এক দশকের মিথ্যাচার। এক দশক ধরে প্রতিটি দিন বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন এরশাদের আপাত ভালো মানুষের বিপ্রতীপে থাকা অত্যাচারিত এক গণ-হত্যাকারীকে। তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে এরশাদ একজন বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। এরশাদবিরোধী এই গণ-আন্দোলনের আঁচ পাওয়া যায় একাধিক কবিতায়—

১) ‘তোমার কলঙ্ক এখন দিনের আলোর মতো প্রকাশিত
সেনাপতি তোমার উলঙ্গ দেহটাকে
এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে
বাংলাদেশ তোমাকে দেখে নেবে
প্রচণ্ড উল্লাসে তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়বে
অশ্লীল তোষামদ আর স্বার্থের মারপ্যাঁচে
তুমি অন্ধ হয়ে গেছ

তোমায় এখন ঠিক কুঁজো বামুনের মতো লাগছে
আর তোমাকে ছাড়াছাড়ি নেই
বাংলাদেশ ভীষণ রেগে গেছে
বাংলাদেশ তোমার দেখে নেবে।'[৯৪] (বাংলাদেশ রেগে গেছে)

২) 'তোমাকে চায় না এই সিংহাসন, সংবিধান, জাতীয় সঙ্গীত
তোমাকে চায় না এই মানচিত্র, জাতীয় পতাকা
তুমি চ'লে যাও, দেশ ছেড়ে যাও।'[৯৫] (বাংলাদেশ চায় না তোমাকে)

কবিদের এই ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হয়নি। জনগণের আন্দোলন অচিরেই সংঘবদ্ধরূপ নিয়ে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয় ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর। ঐদিন বাংলাদেশ সচিবালয়সহ সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দান করেন। চাপের মুখে এরশাদ পদত্যাগ করেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবসান ঘটে দেড় দশকের সামরিক শাসনের। ডিসেম্বরের এই গণ-অভ্যুত্থানের উত্তেজনা ধরা পড়েছে আব্দুল হাই শিকদারেরর কবিতায়—

'সর্প স্কন্ধ জোহাক সিপন্দ পাহাড়ের শয়তান
লবণ স্পর্শ পেয়ে নত হলো রক্তচোষা জোঁক

ডিসেম্বর '৯০ আজ আশ্চর্য এক নাম।'[৯৬] (ডিসেম্বর' ৯০)

এভাবেই বাংলাদেশের আটের দশকের কবিতা বার বার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমকালকে প্রকাশ করেছে। এই সময়ের কবিতায় সত্য-সুন্দরের সাধনার পরিবর্তে ক্লান্তি-জিজ্ঞাসা-অবক্ষয়-নৈরাশ্য অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ সত্তরের রক্তাক্ত সময়কে অতিক্রম করে আটের দশক বাংলাদেশে কোনো সুস্থির সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সামরিক

বাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি হয়ে পড়েছিল নিয়তি-নির্ভর। এই কারণে আটের দশকের কবিরা সমাজ, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করেন। তাঁরা আরো বেশি করে আত্মজৈবনিক-স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশির কবিতায় রাজনীতি অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে। কারণ সমকালীন যুগকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে সাহিত্যসাধনা করা সম্ভব হয়না। আশির দশকের কবিদের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। তাই আশির দশকের কবিতায় রাজনীতি এসেছে অত্যন্ত সচেতনভাবে, যেখানে যুগযন্ত্রণা এবং কবিদের বিতৃষ্ণা একত্রে মিশে গেছে।

৩. আর্থ-সামাজিক সংকট

রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটি প্রগতিশীল পথে অগ্রসর হবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের পক্ষে ভেঙে পড়া আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে অবলম্বন হঠাৎ করেই ঘুড়ে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়নি। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল—১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর শাসনকালে শিল্প ও কৃষিকে রাষ্ট্রের অধীনে রেখে সমাজতান্ত্রিক বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য। অন্যদিকে তাঁর মৃত্যুর পর গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত পনেরো বছরে পাঁচবার সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। মোশতাক সরকার, সায়েম সরকার, জিয়া সরকার, সাত্তার সরকার এবং এরশাদের সরকার—প্রত্যেকেই ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই সময়ে এমন সব নীতি গৃহীত হয়েছে যা বাংলাদেশকে ক্রমেই পুঁজিবাদী রাষ্টে পরিণত করেছে। সমাজের কতিপয় সুবিধাবাদী মানুষের হাতে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ায় সমাজের ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক মেরুকরণ স্পষ্ট হয়েছে। এই ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এরশাদের আমলে। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দেড় দশকের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আমলে বাংলাদেশ কার্যত মধ্যস্বত্বভোগী সুবিধাবাদী, পেটি-বুর্জোয়া ও দালালদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়। এই সময়ে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হয়েছে, পুঁজির সংকট দেখা দিয়েছে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিম্নমুখী হয়েছে, গ্রামীণ ও শহর এলাকার শ্রমজীবী মানুষের মাথাপিছু আয় হ্রাস পেয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দুর্ভিক্ষের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও। স্বাভাবিকভাবে বিপর্যস্ত এই আর্থ-সামাজিকপ্রেক্ষিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে যে প্রভাবিত করবে তা স্বাভাবিক ঘটনা। এই কারণে দেখা যায় দীর্ঘ এই সময়কালে যে-সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে, সেখানে খেটে খাওয়া মানুষের চাওয়া-পাওয়া যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি

সমাজতন্ত্রের অবক্ষয়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতায় আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

বাংলাদেশের জনগণ ভেবেছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ হবে সব-পেয়েছির দেশ। যেখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের কোনো সমস্যা হবে না। কারণ সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভ করে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ তেমনই স্বপ্ন দেখিয়েছিল বাংলাদেশের জনগণকে। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী ভেঙে পড়া সমাজ কাঠামোকে সুস্থিরভাবে গড়ে তুলতে যে সময়ের প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণ ধৈর্য বাংলাদেশের জনগণের ছিল না। দীর্ঘ সময়ের বঞ্চনা তাঁদের মধ্যে যে স্বপ্নভঙ্গের যে বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের এই প্রত্যাশা অমূলক নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সরকার তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার শুরুতে বাজারের দখল চলে যায় চোরাকারবারি-পাচারকারী-মজুতদারদের হাতে। ফলে জিনিসপত্রের দাম শুরুতেই জনগণের নাগালের বাইরে চলে যায়। সুসময়ের স্বপ্ন নিমেষে পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। এই স্বপ্নভঙ্গের কথা ফুটে উঠেছে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়—

> 'আমি একজন সৎমানুষের সাক্ষাৎপ্রার্থী,
> এই সুসময়ে নতুন হাওয়ার আকাশজোড়া বিজয়োৎসবে।
>
> না, এখনো তার দেখা পাইনি। বরং দেখি
> কালোবাজারের আঁধারে সবাই জমছে একে একে।
> মওজুতদারি, চোরাচালান আর ভেজালের ভিড়ে
> খাঁটি কিছুই নেই, মানুষও একাকার।'[৯৭] (একটি সাক্ষাৎকারের প্রত্যাশায়)

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ ছিল কম। এই সমস্যাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছিল চোরাচালান-মজুতদারদের একটি অংশ। এরা ভারতের কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলে অবৈধ আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য শুরু করেছিল। বাংলাদেশ থেকে ভারতে যেত চাল এবং

পাট, বিনিময়ে বাংলাদেশ পেত নিম্নমানের পণ্যসামগ্রী। এই সময় বাংলাদেশে যে পরিমাণ ধান উৎপাদন হত তা বাংলাদেশের জনগণের জীবন নির্বাহে যথেষ্ট ছিল না। সেখানে দাঁড়িয়ে অন্যদেশকে চাল রপ্তানি করার ফলে দেশে খাদ্য-সংকট শুরু হয়। এই খাদ্য-সংকট ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের রূপ নেয়। খাদ্যের অভাবে মানুষ অনাহারে মরতে শুরু করে। সামান্য ভাতের জন্য মানুষ সবকিছু ত্যাগ করতেও রাজি হয়েছিল এই সময়। মানুষের সেই ন্যূনতম দাবির কথা উঠে এসেছে একাধিক কবির কবিতায়—

১) ‘আমার সামান্য দাবি : পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর—
ভাত চাই—এই চাওয়া সরাসরি—ঠাণ্ডা বা গরম,
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চালে হ’লে
কোনো ক্ষতি নেই—মাটির শানকি-ভর্তি ভাত চাই :
দু’বেলা দু’মুঠো হলে ছেড়ে দেবো অন্যসব দাবি।’[৯৮] (ভাত দে হারামজাদা)

২) ‘আমি শুধু খাদ্য চাই, চাই জল সমৃদ্ধ স্বদেশ
আমি এই শতাব্দীর অনাহারী বিনিদ্র স্বজন
গ্রাম গঞ্জে বসে থাকা ক্ষুধার কাতর সব মানুষের ভাই
আমাকে মমতা দাও, দাও ধান-ভাতের সুবাস
ক্ষুধার বিরুদ্ধে কারো প্রতিবাদী সবগুলো সবল পেশিকে।’[৯৯] (অনাহারী মানুষের কথা)

দু’বেলা দু’মুঠো অন্ন প্রত্যাশী এই সাধারণ মানুষের দল ভাতের জন্যই নিজের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে নিজেদের পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার তলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে-দিনের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ভাষণ তাঁদের মনে স্বচ্ছল জীবনযাপনের প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল, তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সুন্দর সংসার গড়ার। কিন্তু রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার সম্মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে সে-দিনের রাজনৈতিক নেতারা। ফলে দেশ হয়তো আক্ষরিক অর্থে স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু

দেশের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসেনি। ফলে সামাজিক স্বাধীনতাও অধরা থেকে গেছে। আর্থ-সামাজিক এই পরাধীনতার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক জীবনেও দেখা দিয়েছে অবক্ষয়। সমাজতন্ত্রের এই অবমূল্যায়ন দেখে হেলাল হাফিজ বলেছেন—

'কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমাদের সব দুঃখ জমা দেবো যৌথ-খামারে,
সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে সমান সুখের ভাগ
সকলেই নিয়ে যাবো নিজের সংসারে।'[১০০] (একটি পতাকা পেলে)

কিন্তু এই সৌভাগ্য বাংলাদেশের জনগণের হয়নি কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলাই শুরু হয়েছিল ভেঙে পড়া আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রশাসনিক অদূরদর্শিতা। অন্যদিকে জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের দেশজ উৎপাদনের মূল অবলম্বন ছিল কৃষিকাজ। সে-কারণে ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতির বাংলাদেশে চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি বরং তা নিম্নগামী হয়েছে। কৃষিকার্যের পাশাপাশি অন্য যে ক্ষেত্রটি সামাজিক উন্নতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে সেটি হল শিল্প। কিন্তু কৃষি এবং শিল্প দুটি ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির হার স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আট বছরে কৃষিক্ষেত্রে গড় বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৩.৭ শতাংশ। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালে এই বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়িয়েছে ১.৬৪ শতাংশ। কারণ এই সময় গুরুত্ব পেয়েছে প্রতিরক্ষা খাত, তাল মিলিয়ে বঞ্চিত হয়েছে কৃষিক্ষেত্র। শিল্পখাতে এই বৃদ্ধির হার শোচনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালে শিল্পের বৃদ্ধি ছিল ১২.৮৩ শতাংশ। কিন্তু পরবর্তী দশ বছরে এই হার কমে দাঁড়ায় ২.৫৫ শতাংশ।[১০০] এর প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি বিশেষ সুবিধাবাদী শ্রেণির হাতে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমাজে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট হয়ে

ওঠেছে। মহাদেব সাহার কবিতায় ধরা পড়েছে সেই বিভেদের কথা। একদিকে যখন একশ্রেণির মানুষ সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে, তখন অন্যদিকে কবি লক্ষ করেন—

'একটি মাত্র মানুষ সারাদিন ইট ভাঙে
ঘামে ভেজে আর রোদে ঝলসায় পিঠ,
একটির পরে সাজায় একটি ইট—
তবু তার শিশু ক্ষুধার অন্ন মাঙে;'[১০২] (দিনমজুরের গান)

অন্যের জন্য এরা অট্টালিকা তৈরি করলেও নিজেরা থাকে আশ্রয়হীন, অনাহারে। সামাজিক এই বৈষম্যের অবসান ঘটাতে গেলে সর্বাগ্রে চাই শোষণমুক্ত সমাজ। শোষণমুক্ত এই সমাজ গঠনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা নিতে হবে দেশের মেহনতি মানুষকে। তাঁদের লড়াইয়ের পথ ধরেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমাজতন্ত্রের ভিত। এজন্য বাংলাদেশের জনগণকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ যদি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এবং দল-মতের পার্থক্য ভুলে জাতির গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হন—তবেই সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তা না হলে দুমুঠো অন্ন, একটু আশ্রয় সবই কল্পনার বস্তু হয়ে থেকে যাবে, বাস্তবে রূপ লাভ করবে না। সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ—

'তোমার নরোম কোমল কোল জুড়ে নিশ্চয়ই একদিন
সবুজ পাতার মতো ফুটফুটে শিশু ফুটবে, বৃষ্টিধারার মতো
পর্বতের ঢালু বেয়ে নেমে আসবে তার খিলখিল হাসির শব্দ।
—কিন্তু তার আগে চাই সমাজতন্ত্র।'[১০৩] (তার আগে চাই সমাজতন্ত্র)

মুক্তির জন্য স্বপ্ন দেখা এবং সেই মুক্তি কোন পথে আসবে তাঁর পথ অন্বেষণ করার মধ্যে বিস্তর ফারাক। সাহস থাকলেই স্বপ্ন দেখা যায় কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে চাই উপযুক্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ স্বাধীন বাংলাদেশে ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা জনদরদী নেতা হতে চাননি, তুখোড় রাজনীতিবিদ হতে চেয়েছেন।

তাঁরা শোষণমুক্তির অবসান নয়, উল্টে সংবিধান নামক রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের আত্মরক্ষা এবং স্বার্থরক্ষা উভয় কাজে লাগিয়ে নিজেদের আসনকে সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছেন। আর একাজে তাঁরা ব্যবহার করেছেন সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে। সর্বহারা মানুষের লড়াইয়ে কেউ পাশে নেই। তাই শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে ভুক্তভোগী বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত মানুষদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। যেহেতু তাঁরা সর্বহারা, নতুন করে হারানোর তাঁদের কিছু নেই। নব্য-সমাজ গঠনে তাঁদের অতীত সংগ্রামের প্রতিই আস্থা রেখেছেন কবি বিমল গুহ—

'ক্ষুধার্ত মানুষ পারে সবকিছু
তার কাছে ভালোমন্দ, উঁচুনিচু
বিধেদ থাকে না-নিমেষে সে রাজ্য লোপাট
করে বসে, ফুঁ দিয়ে নিভায় আলো, পথঘাট
বিপজ্জনকভাবে বিষকাঁটালির ঝোপে
পরিণত করে, এক কোপে
দ্বিখণ্ডিত করে দেয় তামাম দুনিয়া।'[১০৪] (ক্ষুধার্ত মানুষ পারে)

ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষমতার প্রতি আস্থা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই কবি সচেতনভাবে 'ভালোমন্দ', 'উঁচুনিচু' শব্দবন্ধ দুটিকে ব্যবহার করে একশ্রেণির মানুষের সুবিধাবাদী মানসিকতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপন স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখেই যোগদান করেছে। এরা ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে যোগদান করেছে, শ্লোগানে গলা মিলিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধেও যোগদান করেছে, কিন্তু সামনে থেকে নয় নিজেদেরকে আড়ালে রেখে। কারণ তারা কখনই শাসকের রোষের শিকার হতে চায়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এরাই মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যকে আত্মস্থ করে দিনরাত মুখে বিপ্লবী বুলি আউড়েছে। তাদের নজর একটাই—নতুন দেশের নতুন শাসকের আনুগত্যলাভ। এই আনুগত্যলাভের বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। শাসকশক্তি তাদেরকে ব্যবহার করেই সমাজে শ্রেণি-বৈষম্যকে বজায় রেখেছে, কুরে কুরে খেয়েছে রাষ্ট্র কাঠামোকে।

সম্ভাবনাহীন এই বাংলাদেশে আজ মানুষ এতটাই আশ্রয়হীন ও অসহায় যে স্বপ্নকে সফল করা দূর অস্ত, স্বপ্ন দেখতেই সে ভয় পেয়েছে। কবি তাঁর মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন স্বপ্ন দেখার আর্জি নিয়ে আবেদনপত্র হাতে সাধারণ মানুষকে—

'বিশেষ অনুমতি ছাড়া কখনো যাবে না দেখা স্বপ্নের পাড়া।
: তিজেলে ফুটছে ভাত
বৌয়ের পরণে তাঁতের শাড়ি
দাওয়ায় বসে বেড়ালের শিশুর সাথে খেলা করছে ছেলে,
এইসব নিয়ে যেন স্বপ্ন দেখতে পারি।'[১০৫] (স্বপ্ন দেখার জন্য আবেদনপত্র)

কবিতাংশটির মধ্যে একটি ভয়ংকর সত্য লুকিয়ে আছে। শাসক তার রাষ্ট্রযন্ত্রের যাঁতাকলে শ্রমজীবী মানুষগুলোকে কেবল শোষণ করেই ক্ষান্ত হয় না। তাদের ভাবনা-চিন্তাকেও প্রভাবিত করতে চায়। তারা কী খাবে, কী ভাববে তাও ঠিক করে দিয়ে হয়ে উঠতে চায় তাদের ভাগ্যবিধাতা। এভাবেই রাষ্ট্র মানুষের স্বপ্ন কেড়ে নেয়, আর সাধারণ মানুষ অনাহারে রাত্রিযাপন করে। রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে ভোরের আলো ফুটলেও সেই ভোর তাদের জীবনে কোনো নতুন প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হয় না। দিনের আলোতে নতুন করে শুরু হয় বেঁচে থাকার লড়াই। যে ক্ষেতে সে চাষ করে তা জমিদারের। যে মজুরি সে পায় তার সিংহভাগ চলে যায় মহাজনদের দেনা মেটাতে। বাকি যে সামান্য অংশ তার প্রাপ্য হয় তাতে তার সংসার চলেনা। কৃষকের সংসারের এই নির্মম বাস্তবতাকে কবি প্রথমে প্রকৃতি এবং পরে স্বদেশের প্রেক্ষাপটে ধরেছেন। যেখানে বিপর্যয় গ্রাস করেছেন মানুষ-মানবসভ্যতা-স্বদেশকে—

'সোনালি ধানের ক্ষেতে সাদাচোখে জেগে আছে অপুষ্ট ছড়ারা
খরার আগুন তাকে ছিন্নমূল মানুষের মতো
অসহায়, করুণ করেছে। অনাবৃষ্টি অনুর্বর করেছে প্রান্তর।

সমগ্র স্বদেশজুড়ে অনাহার মৃত্যু আর ক্ষুধার আগুন

আদিগন্ত মাঠ বুকে শুয়ে থাকে মলিন রাতেরা
প্রতিবাদহীনদের মতো নামে এক মুখবিজা অসহ্য সময়
স্বস্তিহীন জাগে মাটি—ঘুম তার দু'চোখে আসে না
ক্ষুধিত পাষাণ শুধু ঘিরে থাকে দেশের হৃদয়।'[১০৬] (খরা)

বাংলাদেশের এই দুর্দশার জন্য দায়ী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ক্ষমতা দখলের জন্য তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় বসে তিনি কোনোটিই পালন করেননি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন যেখানে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। জাতীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ করা হবে, কৃষি উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, ভূমি সংস্কার করা হবে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এর কোনোটিই বাস্তবে কার্যকরী হয়নি। দেশের মানুষের কাছে নিজের ভাবমূর্তিটিকে ভালো রাখার জন্য কল্পনার ফানুস রচনা করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই মিথ্যাচার উঠে এসেছে আবিদ আনোয়ারের কবিতায়—

'এইভাবে দিন গুণে গুণে
মরতে হবে না, কোনো এক আসছে ফাগুনে
নিশ্চিত উদ্ধার; সমৃদ্ধির গন্ধ থাকবে আগামীর প্রতিটি সালুনে;
ইতোমধ্যেই যেসব পরিকল্পনা নিয়েছি সেগুলো
বাস্তবায়িত হলে ইনশাল্লাহ সেই বিখ্যাত মূলো
আর বেশি দূরে নয়—ফুটপাতে শুয়ে-থাকা নুলো
ও খঞ্জরা তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে না...ভায়েরা,'[১০৭] (প্রিয় দেশবাসী)

এরশাদের আমলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ-সমাজের অবনতি ঘটতে থাকে। আটের দশকে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপায়ে জলসেচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ জলস্তর ক্রমশ নিম্নগামী হয়েছে এবং একইসঙ্গে মাটির উর্বরাশক্তিও কমে গেছে। গরীব কৃষক এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সেচযন্ত্র কিনতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু পুঁজিবাদী

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেচযন্ত্রের দামের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কৃষকের পক্ষে তা ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি চাষের কাজের জলও তাদের ভাড়ার বিনিময়ে কিনতে হত। এই জলভাড়া মেটাতে কৃষকদের ফসলের তিনভাগের একভাগ দিতে হত। অবস্থাসম্পন্ন কৃষকের সমস্যা না হলেও এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন গরীব-প্রান্তিক কৃষকরা। কেবল সেচব্যবস্থা নয়, চাষের কাজে ব্যবহৃত সারের দামবৃদ্ধিও সমস্যায় ফেলেছিল প্রায় সর্বহারা এই কৃষক শ্রেণিকে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার কৃষকদের চাষের জন্য সারের উপর ভর্তুকি বা ছাড় দিত। ফলে সারের দাম গরীব কৃষকদের আওতার মধ্যে ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন সরকার সারের উপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে সারের দাম বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আর্থিক সমৃদ্ধির কারণে ধনী কৃষকরাই কেবল সার ব্যবহার করতে শুরু করেন। অন্যদিকে অর্থের অভাবে গরীব কৃষকরা সার ছাড়াই চাষাবাদ করতে বাধ্য হন। ফলে তাঁদের জমিতে উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে। এইভাবে গ্রামীণ সমাজেই ধনী ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যে একটা ফারাক তৈরি হয়। রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের এই ফারাক যে আসলে পুঁজিবাদ সমর্থিত রাষ্ট্রের পরিকল্পিত প্রতারণা, সেকথা ধরিয়ে দেন কবি কামাল চৌধুরী—

‘গোলায় ওঠেনি ধান
এত সার, এত সেচ
প্রযুক্তির এত মন্ত্রগাঁথা
তবুও স্বনির্ভর এক বিপ্লবের পোকা
মেরে গেল মূর্খ কৃষকেরে।

একত্রিশ বছর গেল জাগতিক ভূমি কর্ষণে
ক্ষয়ে গেল উর্বরতা মাটি ও বোধের

আকাঙ্ক্ষার চাষাবাদ হলো না তবুও।’[১০৮] (আকাঙ্ক্ষার চাষাবাদ)

কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ না পাওয়ার কারণ জনগণের সঙ্গে শাসকের দূরত্ব বাড়ে। সামরিক ক্ষমতায় ভর করেই এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এবং প্রায় এক দশক রাজত্ব করেছেন। এই সময় বাংলাদেশের ভূমি-কেন্দ্রিক অর্থনীতির উন্নতি না হওয়ার প্রান্তবাসী মানুষ নির্মম অবহেলা ও শোষণের শিকার হয়েছেন। প্রতিমুহূর্তে তাঁরা অভাব-অনটনকে সঙ্গে নিয়েই দিনযাপন করেছেন। পাড় ভাঙার আওয়াজ যেমন নদীর প্রবল গর্জনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, তৎকালীন ক্ষুধার্ত মানুষের চিৎকারও তেমনি নাগরিক উল্লাস এবং রাজনীতির স্লোগানের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছে, শাসকের কান পর্যন্ত তা পৌঁছোয়নি। দীর্ঘ এক দশকের সামরিক শাসনের এই অবস্থাকে 'কলিযুগ'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি শিহাব সরকার—

'রাজধানীতে ঘটেছে দশটি হত্যাকাণ্ড
গলায় ফাঁস লাগিয়েছে দু'জন যুবতী একজন যুবা
সন্ধ্যারাতে নির্জন পথে
ডাকাতেরা সর্বস্ব লুটে নিয়েছে পথিকের
সারারাত জলসা তামাশা-রঙ্গ হয়েছে সামান্য দূরে।
রাজার বিরুদ্ধে ছুটোছাটা মিছিল দেখা যায়।'[১০৯] (কলিযুগ)

সামাজিক অবক্ষয়ের একাধিক স্তর বিভাজন করেছেন কবি। একদিকে চলছে খুন, গুপ্তহত্যা। বোঝা যায় এই সময় ভেঙে পড়েছিল শহরের আইনশৃঙ্খলা। অন্যদিকে আত্মহত্যার প্রসঙ্গটিকেও উত্থাপন করেছেন কবি। যুবক-যুবতীর আত্মহত্যা একথাই প্রমাণ করে শিক্ষিত সমাজের সামনে বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ সে-দিন ছিলনা। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশে বেকার সংখ্যা প্রায় দু কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই আত্মহত্যা সেই বেকারত্বকেই ইঙ্গিত করে। এরই পাশাপাশি জলসার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কবি নাগরিক সমাজের বিকৃতির একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে ছিল এরশাদ-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচি যাকে কবি 'ছুটোছাটা মিছিল'-এর সঙ্গে তুলে করে সেই সময়কার দিশাহীন রাজনীতির একটা পরিচয় দিতে চেয়েছেন। এরশাদের আমলে

একাধিক রাজনৈতিক দল একাধিক কর্মসূচি স্থির করলেও রাজনৈতিক দলগুলি এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। পারস্পারিক বোঝাপড়ার অভাব, সুবিধাভোগের আকাঙ্ক্ষা, শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে যে বিভেদ গড়ে তুলেছিল—তা আসলে এরশাদকে আরও দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকতে সুযোগ করে দিয়েছিল। এই সমস্ত কিছুই কবির কলমে উঠে এসেছে সরাসরি।

রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পাশাপাশি সমাজ-জীবনেও দেখা দিয়েছিল অচলাবস্থা। দীর্ঘ সময় সামরিক বাহিনীর অধীনে বসবাস করার সুবাদে সামরিক শাসনের আতঙ্ক মধ্যবিত্ত বাঙালিকে মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত করেছিল যে সরকার-বিরোধী কোনো আওয়াজ তাদের একটা বড় অংশের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়নি। ফলে অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে বাধ্য হয়েই তারা সুবিধাবাদীদের দলে নাম লিখিয়েছে। বিকিয়ে দিয়েছে নিজের আত্মসম্মানকে। তার ভেতরের প্রতিবাদী সত্তা গেছে নষ্ট হয়ে। তাই সে আজ সরকারি চাকুরে হলেও নির্জীব মৃতপ্রায়। তার অবস্থাকে কবি তুলনা করেছেন বীর ক্রীতদাস নেতা স্পার্টাকাসের সঙ্গে। স্পার্টাকাস ক্রীতদাস হলেও তাঁর বিপ্লবী মানসিকতাকে একমুহূতের্র জন্য ত্যাগ করেননি। স্বাধীনচেতা মন নিয়ে নিজেদেরকে স্বাধীন করার তাগিদে প্রাণ বাজি রেখে তিনি লড়েছেন রোমান সৈন্যদের সঙ্গে। শেষপর্যন্ত পরাজিত হলেও একটি বারের জন্য তিনি পিছু হটেননি। আর এরশাদের আমলে বাংলাদেশের বাঙালিরা নিজেদেরকে সংগঠিত করে সরকার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এই মানসিক দীনতা ফুটে উঠেছে জাহাঙ্গীর ফিরোজের কবিতায়—

> ‘স্পার্টাকাস, এশতকে কোনো ক্রীতদাস নেই
> সকলেই চাকরিজীবী
> চাকরিজীবীদের কোনো স্পার্টাকাস নেই
> চাকরিজীবীদের হাত ও কলমের মাঝে তৃতীয় পুরুষ।’[১১০] (স্পার্টাকাস নেই)

এই সংকট মানুষকে ধীরে ধীরে এমন একটি সমাজের দিকে ঠেলে দেয় যেখানে মানুষ সুস্থতাকে বিসর্জন দিয়ে বিকৃতিকেই বেঁচে থাকার উপাদান বলে গ্রহণ করে। অর্থ ও

অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে শিকড়চ্যুত হয় যুবসমাজ, পরিণত হয় ভোগবাদী সমাজের নষ্ট কীটে। যাদের কাছে দিনের আলো বড় অস্বস্তিকর। রাতের অন্ধকারই তাদের চলাফেরার, বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। এরশাদের আমলে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদের সিংহভাগ চলে যাওয়ায়, আর্থিক দিক থেকে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় দূরত্ব। এই সময় সমাজসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু মানুষ বিকৃতি, আত্মসুখপরায়ণতা এবং ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভোগবাদী এই নষ্ট সমাজের খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে একাধিক কবিতায়—

১) ‘এ শহর, মধ্যরাতে
তরল আগুনে জ্বলে উন্মাতাল উদ্
কোট খুলে বহুদিন পর নিজস্ব পুকুরে নামে
টেরপায় আর্দালি নেয়ে গেছে
‘পিওর আদত’ জামালের বাংলা সাবধানে;
পারফিউম ছিন্ন করে ডিভানের পাশ থেকে
ভয় পায় তৃপ্তি মেশানো হাসি
কবন্ধ ক্রীতদাস কেটে পড়ে।’[১১১] (শহর)

২) ‘ক্ষণিকের এই আলো চমকে দিয়েছে তাকে
জন্মান্ধ বাবার হাত ধরে একদিন পাত্র হাতে
অন্ধ শহরের পথে নেমে এসেছিল
সূর্যের আলোতে কোনো আশ্রয় ছিল না
চাঁদ শুধু আতঙ্ক এনেছে
অন্ধের ষষ্ঠিকে টোপ দিয়ে
একদিন টেনে নিলি আলোকিত তোরা।’[১১২] (অন্ধকারের মেয়ে)

কেবল সামাজিক বিপর্যয় নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও গ্রাস করেছিল বাংলাদেশের মানুষকে। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ একাধিকবার খরা, বন্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের

বন্যা ছিল বাংলাদেশে সংঘটিত বিধ্বংসী বন্যাগুলোর মধ্য অন্যতম। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের এই বন্যায় বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি অংশ জলমগ্ন হয়। গৃহহারা হয়েছিল অসংখ্য মানুষ। যে জল মানুষকে প্রাণ দান করে, সেই জলই হয়ে উঠেছিল মানুষের কাছে বিভীষিকা। জলের সেই আগ্রাসন লক্ষ করে কবি মুজিবুল হক কবীর বলেছেন—

‘যে উঠোন ছিলো
শিশুর অযোগ্য পায়ের দখলে
সে উঠোনে এখন
সর্বগ্রাসী জলের আগ্রাসন,
যে ঘর ছিলো
শিশুর বর্ণাঢ্য ভুবন
সেখানে জল মানুষের ‘না না’ অগ্রাহ্য করে
ঢুকে পড়েছে।’[১১৩] (আগ্রাসন)

তবে কবির ইঙ্গিত বোধহয় প্রকৃতির রোষকে ছাড়িয়ে পুঁজিবাদী আগ্রাসনের প্রতি ধাবিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতি, এবং দেশে শিল্পায়নের অভাব। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গ্রাম-শহরের আর্থ-সামাজিক বিকাশগত বৈষম্য। শহরে স্কুল-কলেজ কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে পড়াশোনা বা চাকরি পাওয়ার যে সম্ভাবনা, তা গ্রামীণ পরিবেশে ছিল না। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত দরিদ্র পরিবারে কৃষকের সন্তানের কাছে কৃষক হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কৃষকের পরিবারে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। ফলে গাণিতিক নিয়মেই কৃষক পরিবারের সদস্যরা ভূমিহীন হয়েছে। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়, ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে রাষ্ট্রের পরিকল্পিত কৌশলও ছিল। কৃষক তার কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় করে যে মূল্য পেত, তার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে কৃষি-উপকরণ অর্থাৎ সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি কিনতে হত। চাষ ক্রমশ অলাভজনক এবং পরিবারের খাদ্যাভাষ মেটাতে অক্ষম হওয়ার দরিদ্র কৃষক একপ্রকার

বাধ্য হয়েই তার জমি বিক্রি করে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। এভাবেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে একশ্রেণির শোষক ভূমি-আগ্রাসন চালিয়েছে। এইসব জমি হাঙরদের ওপর ছিল শাসকের পরোক্ষ মদত। জনগণের প্রতি রাষ্ট্রনেতা এরশাদের এই কৃষক-বৈরিতাকে ধিক্কার জানিয়ে কবি মাহমুদ কামাল বলেছেন—

'তুমিই স্বীকৃত এবং চূড়ান্ত মূর্খ
নীতিহীন তোমার প্রযুক্তি
চাই আর্থ-সামাজিক মুক্তি।

তুমি অন্ধকারে বারে বারে
কেন হানা দাও
নৃপতি মুখোশ ফিরে যাও।'[১১৪] (মুখোশ)

কিন্তু ফিরে যেতে বললেই কেউ ক্ষমতা থেকে সরে যায় না। এরশাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতার উপর ভর করে এবং দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতাকে কাজে লাগিয়ে প্রায় এক দশক তিনি বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সুসংহত আর্থ-সামাজিক বিকাশের অভাবে সমাজ-জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে দেখা দিয়েছিল নৈরাজ্য, অবক্ষয়, শূন্যতা। কবিরাও এই সময়ের ঘটনা প্রবাহ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। সত্তর-আশির কবিরা সামাজিক অস্থিরতাকে ধারণ করে আপন উপলব্ধির পর্দায় লেপন করেছেন অনুভূতির রঙ। সে-জন্য এই সময়ের কবিতায় ব্যক্তিগত দুঃখ, বিকৃত সময়, সুবিধাবাদ, নাগরিক বিকৃতি, মনুষ্যত্বের বিকার, নিষ্ফল আশাবাদ একসঙ্গে ভিড় করেছে—

১) 'ভাসমান সংসার আর ভাসমান স্বদেশ বুকে নিয়ে
সে ভেসে যায়, গ্রন্থিল সুখ-দুঃখ বেদনায়
কেঁপে ওঠে—কত শ্যামল সজল মুখ
হাতছানি দেয়; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃখের ওপারে

এক দুঃখহীন জীবনের স্বপ্ন সে দ্যাখে’[১১৫] (দুঃখের স্বরূপ)

২) ‘শিকড় ফুঁড়ে দুঃখগুলো যখন পাতে হাত,
যখন শরণার্থী হয়ে দাঁড়ায়,
আমার যত বন্ধু, যত সুখপায়রার ঝাঁক
হারায়, সবই আচম্বিতে হারায়।’[১১৬] (কপট বলয়)

৩) ‘উড়ছে মৃত্যুর গন্ধমাখা হাওয়া চরাচরে উড়ছে পতাকা
আকাশে আকাশ নেই কবুতরও পলাতক।
সবকিছু শূন্যতায় যেন দুঃখমাখা।’[১১৭] (উড়েছে পতাকা তবু)

৪) ‘এই প্রজন্মের জন্যে ফুল ফোটা চাষাবাদ অর্থহীন
এই প্রজন্মের নেই প্রত্যাশিত ভোরের সৌরভ
দারিদ্রসীমার নিচে অতলান্তে হাবুডুবু এই প্রজন্মের
শুধু আছে বীজাণুবলয় বিষ দীর্ঘশ্বাস এবং বারুদ।’[১১৮] (চারদিক বীজাণু ও ধোঁয়া)

৫) ‘পশুর রাজত্বে আছি:
প্রতিদিন ভোরবেলা জগিংয়ের শেষে
শিঙের স্বাস্থ্য দেখে মহিষের দল;
প্রায়শ রাস্তার মোড়ে দেখা হলে জনৈক গণ্ডার
‘কেমন আছেন’ ব’লে হাসিমুখে কুশল শুধায়।’[১১৯] (বসবাস)

৬) ‘মানুষে বিশ্বাস রাখি না কারণ আজকাল

মানুষ জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে গিলে খাচ্ছে
পৃথিবীর সমস্ত সবুজ
এবং সুখের মতো সকল সরল বিশ্বাস।'[১২০] (মানুষে বিশ্বাস রাখি না)

৭) 'সহজে সুবিধা পায় পৃথিবীতে
মানুষের হৃদযন্ত্র তাদের দখলে
সুবিধাভোগীর চোখ যারা স্বার্থপর
হীনজন উদ্বোধক রবীন্দ্রসন্ধ্যার—
আর যারা দিন আনে দিন খায়
বাধ্য হয়ে জমি থোয় ভূমিহীন কিষাণের ঝাঁক'[১২১] (মধ্যবিত্ত)

৪. দুঃসময় উত্তীর্ণ হওয়ার আশাবাদ

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রথম দু-দশকের রাজনীতি জনগণের কোনো রকম প্রত্যাশাই পূর্ণ করতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু দেশের শাসন ক্ষমতায় বসে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও তাঁর স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সদ্য যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক কাঠামো। এমনকি তাঁর প্রশাসনিক পরিমণ্ডলও তাঁর প্রতিকূলে ছিল। তাও তিনি দেশকে গড়ে তোলার চেষ্টাস্বরূপ একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আটের দশকের শেষাবধি পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় একাধিক সরকার পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেকেই সমাজতন্ত্রের ধারণাকে বর্জন করে বাংলাদেশকে ধনতন্ত্রের কাঠামোতে সাজাতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। দেশ স্বাধীন হলেও দেশের মানুষ আর্থিক স্বাধীনতা আসেনি। সাধারণ মানুষের এই বেদনা-অপ্রাপ্তি-ক্ষোভের উত্তাপকে নিজেদের কলমে ধারণ করেছিলেন দেশের কবিরাও। সে-কারণে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের কবিতায় বড়ো হয়ে উঠেছিল স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কিন্তু কেবল হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চাননি বাংলাদেশের কবিরা। যুগের হতাশা, নৈরাজ্য, অবক্ষয়কে কাটিয়ে বাংলাদেশের কবিরা রচনা করতে চেয়েছিলেন এমন কবিতা যেখানে আছে বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথাও। ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যে প্রাণিত হয়ে দেশের কবিরা এগিয়ে এসেছিলেন নতুন ভোরের প্রত্যাশায়। তাই কেবল শোষিত জনগণের হাহাকার-অরাজকতা নয়, শৃঙ্খলমুক্তির স্বপ্নও রূপ পেয়েছে কবিতায়। নৈরাজ্যের অন্ধকার থেকে মুক্তিপিয়াসী এবং একটি স্বপ্নের সমাজ-কাঠামো গড়ে তোলায় আশাবাদী ছিলেন কবিরা। সে-কারণে এই সময়ের একাধিক কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে দুঃসময়কে অতিক্রম করে নতুন সমাজ গঠনের আশাবাদ।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসে শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের আবেগকে কেন্দ্র করেই দেশকে আগামীর উজ্জ্বল পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নপূরণে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল তাঁর দেশের স্বার্থান্বেষীদের একাংশ। মুজিব-পরবর্তী শাসকরা বাঙালির মন থেকেই একাত্তরের ত্যাগের মহিমাকে মুছে ফেলতে বদ্ধ

পরিকর ছিলেন। কিন্তু একাত্তরের নয় মাস জুড়ে যে পরিমাণ রক্ত ঝরিয়ে জনগণ ছিনিয়ে নিয়েছিল নিজেদের স্বাধীনতা, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাঙালি জাতি হিসাবে তা চিরন্তন। তাঁদের সেই ক্ষত আজও অমলিন। আজও সমানতালে রক্ত ও অশ্রুর ক্ষরণ হলেও চেতনাশক্তি লুপ্ত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ফলাফলকে বুকে ধারণ করে আজও তাঁরা প্রতিমুহূর্তে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। জনগণের সেই স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছে আবিদ আনোয়ারের কবিতায়—

'নিরিবিলি ক্ষতস্থান চেটে
আহত হরিণ যায় চারণভূমিতে,
বারুদের গন্ধ শুঁকে সাহসী পাখির ঝাঁক ফিরে যায় বিলে-
আমিও তেমনি যেন কালের কয়েদী, গায়ে তবু জীবনের জামা,
স্বপ্নখেকো সময়ের বীভৎস থাবার পাশে
অবাক জ্বালিয়ে রাখি ব্যক্তিগত চাঁদের পূর্ণিমা।'[১২২] (কবলিত মানচিত্রে)

কেবল আবিদ আনোয়ার নয় ব্যক্তিগত এই আশাবাদের কথা ধ্বনিত হয়েছে মহাদেব সাহার কবিতাতেও—

'এই দেশ বলে, মানুষের সত্তার শুদ্ধতা বলে
আমিও তেমনি বলি সবচেয়ে সত্য আর মর্মান্তিক একটি সংবাদ:
আমি ছিন্নভিন্ন—
আমার সমস্ত সত্তা ছিন্নভিন্ন, ছিন্নভিন্ন আমার শরীর
ছিন্নভিন্ন, তবুও দাঁড়িয়ে আছি।'[১২৩] (আমি ছিন্নভিন্ন)

এই 'ছিন্নভিন্ন' শব্দবন্ধে লুকিয়ে আছে সামরিক শাসনের নির্মমতা। আগেই আলোচিত হয়েছে যে এরশাদের আমলে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলির আর্দশগত ঐক্য না থাকলেও ছাত্র আন্দোলন এরশাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার জন্য এরশাদ সরকার একাধিকবার ছাত্রদের আন্দোলনে গুলি চালানোর পাশাপাশি ছাত্র মিছিলে ট্রাক তুলে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। স্বৈরশাসনের এই

বর্বরতার মধ্যে কবি লক্ষ করেছেন স্বাধীনতার লাঞ্ছনা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশ নামটি উচ্চারণ করলেই সর্বস্তরের শ্রমিক-শিল্পীরা এক হয়ে যেতেন। একটি পতাকার জন্য তাঁরা নিজেদের প্রাণকে বলিদান দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু আজ মানুষের মন থেকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা আজ স্বাধীন দেশের ক্রীতদাস। সময়ের পাতায় কেবলই রাজাকারদের আস্ফালন। এই অন্ধকার সময়কে দূরে সরিয়ে আশার আলো জ্বালাতে গেলে বাঙালির অন্তরে সুপ্ত থাকা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। এই চেতনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস, বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস। কিন্তু এই চেতনাকে জাগ্রত করে তোলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বৈরশাসন। এই স্বৈরশাসনের ভীতিকে কাটিয়ে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কবি জয়নুল, বসুনিয়া, শেখ মুজিবের মতো নেতার আগমন প্রার্থনা করেছেন। যাঁরা নতুন বাংলাদেশের জন্ম দেবেন। যে দেশ জিয়াউর, এরশাদের দেশ নয়, যে দেশ একান্তই বাঙালির স্বাধীনভূমি—

> 'কখন একটি উন্নত মানুষ হেঁটে আসবে তার জন্যে,
> তার শরীরে রক্তাক্ত একটি ছিদ্র রচনার জন্যে—
> যে-ছিদ্র থেকে আমি আশা করছি, আশাই তো একমাত্র, যে,
> আমরা জন্মগ্রহণ করব,
> আমরা জন্মগ্রহণ করব,
> আমরা জন্মগ্রহণ করব,
> এই চিৎকার, এই ধবল ধ্বনি ছড়িয়ে পড়বে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলে।।'[১২৪] (আমি জন্মগ্রহণ করিনি)

কিন্তু এই নতুন জন্মভূমি গড়ে তোলার জন্য যে দক্ষ সংগঠকের প্রয়োজন তা সে-দিনের বাংলাদেশে ছিল না। সামরিক শাসনের আতঙ্কে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। গণচেতনার এই নির্জীবতা বেড়ে উঠেছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্রেও। এরশাদের আমলের রাজনৈতিক অরাজকতা এই সময়ের মুক্তচিন্তাচর্চায় প্রতিকূল পরিবেশ

তৈরি করেছিল। জনগণের সঙ্গে সঙ্গে কবিরাও এক ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের মানসিক অস্থিরতা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে সংস্কৃতি জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তাতে দীর্ঘদিনের অর্জিত যে মূল্যবোধ তার বিনাশ ঘটবে। এই আশঙ্কা চিন্তিত করেছিল এই সময়ের সাহিত্যিকদের। প্রতিকূল সময়ের মোকাবিলা করার জন্য কবিরা রচনা করেছিলেন একের পর এক প্রতিবাদী কবিতা যা জনগণের মনে সংগ্রামী চেতনা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। সময়ের পথ প্রদক্ষিণ করতে করতে কবিরা দেখছেন একের পর এক ঘটনা যা ইতিহাস হয়ে গেছে। সবুজ-শ্যামল মাতৃভূমি আজ নরখাদকের আক্রমণে রক্তরঞ্জিত মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত। প্রতিমুহূর্তে আর্তের হাহাকার আর ধর্ষিতার করুণ বিলাপে ভারী হয়ে ওঠে বাংলাদেশের বাতাস। বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয়, মুক্তিকামী জনগণ, কল্যাণ-প্রত্যাশী লেখক-শিল্পীরা এই আবরণহীন নগ্নতার জন্য একাত্তরের যুদ্ধে রক্ত ঝরাননি। তাঁরা শিশুর হাসি দেখতে চেয়েছিলেন, সন্ত্রাসের চিৎকার নয়। কিন্তু অরাজকতার বধ্যভূমি বাংলাদেশে আজ কেবলই দুঃশাসনের দাপাদাপি। কিন্তু কালের ইতিহাস সাক্ষী, শোষকের শোষণকে সবসময়ই ছাপিয়ে গিয়েছে শোষিতের সংগ্রাম। শেষ হাসি বরাবর তারাই হেসেছে। তাই ইতিহাসের প্রতি আস্থা রেখে শেষবারের মতো বাংলাদেশের বুক থেকে শ্বাপদের পদচিহ্ন মুছে ফেলতে জনগণকে সমবেত সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছেন কবিরা—

১) ‘এখন থেকে পৃথিবীতে আলো হবে শোকহীন
সামাজিক ঘূর্ণিঝড়ে আঁধারকণা গলে যাবে আলোময়
শুধু গর্জে উঠুক ক্রোধের উজ্জ্বলতায়
রাজনীতির কাঠামোটা ভেঙে-চুরে জন্ম দেবে
নতুন মানুষ’[১২৫] (মানসিক খরার দিনে)

২) ‘আমরা আমাদের পরিণামের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার আগে

আমরা একবার তোমাদের দেহের আদলটুকু দেখে নিতে চাই,
যাতে আমাদের লেজের আগুনে
স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবার আগে
সময়ের ফাঁক গলে
তোমাদের দেহ কিছুতেই বেরিয়ে আসতে না পারে।'[১২৬] (না আমরা কেউ কাঁদবো না)

নিজেদের সংগ্রামকে কবি রামায়ণের কাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। রাবণের কৃতকর্মের কারণেই স্বর্ণলঙ্কা আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রামের সঙ্গে যুদ্ধেই রাবণের বিনাশ ঘটেছে। কিন্তু এযুগে কোনো রামচন্দ্র নেই। তাই কবি সতর্ক যাতে কোনোভাবেই এরশাদ ও তাঁর সৈন্যবাহিনী এই গণযুদ্ধে জয়ী হতে না পারে। সে-জন্য জনগণকে নতুন করে বাঁচার লড়াইয়ে আহ্বান জানিয়েছেন কবি। কবি জানেন সৈন্যবাহিনীর ভয়ে সাধারণ মানুষ আজ ভীত সন্ত্রস্ত হলেও তাদের অন্তরের সাহসী সত্তা আজও জীবিত। সেই সাহসী সত্তাকে জাগ্রত করতে পারলে সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানুষ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। সে-জন্য জনসাধারণের প্রতি কবির বার্তা—

'জেগে ওঠো সাহসী মানুষ
আমি তোমাদের লোক
যেটুকু লোভ : ঘৃণ্যজীবন ভাগ করো তাকে
বিকশিত হোক অমল মানুষ
তারপর জ্বলে ওঠো
সাহস আর দুঃসাহস অন্যরকম হবে'[১২৭] (জেগে ওঠো সাহসী মানুষ)

কিন্তু জাগিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা এক নয়। কবির মনে সংশয় আছে এই স্বপ্নের বাস্তবায়িত হওয়া নিয়ে। কিন্তু জনগণের প্রবল প্রত্যাশা, সততা ও বিশ্বাসের কাছে কবি লজ্জিত হন তাঁর নৈতিবাচক ভাবনার জন্য। জনগণের মুক্তির জন্য কবি নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন—

'যেমন উৎফুল্ল চাষা ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে
আগামী ফসল বুনে নতুন ভূমিতে—
আমিও তাৎক্ষণিকভাবে তোমার স্বপ্নগুলো
বুনে দিই আকাশের বিশ্বাসী খামারে,
তখন আমার চোখে
ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধটি তার প্রাজ্ঞলাঠি ঠুকে।'[১২৮] (আগামী উৎসব)

কবি দেখেছেন আর্থ-সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত বাংলাদেশে এখন কেবল আর্তের হাহাকার। সরকারি ঔদাসীন্যে গ্রামীণ অর্থনিতি অবহেলিত হয়েছে। ফসলের উৎপাদন হার কমেছে। যতটুকু উৎপাদিত হয় তাও কৃষকের দিনযাপনে যথেষ্ট নয়। কারণ কৃষকের রক্ত-ঘামের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসল মহাজনের আড়তে জমা হয়। আর দেশের জনগণকে বোকা বানিয়ে রাজনীতির কারবারিরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটায়। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ আর ক্ষুধার্ত শিশুর ক্রন্দনে অতিক্রান্ত হয় প্রহরের পর প্রহর। দিশাহীন মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরে। আশাবাদী কবি জানেন চেষ্টা করলে পথ খুঁজে পাওয়া যায়, হয়তো বিশাল জনতাকে নিয়ে ঠিক পথে যেতে দেরি হয়, সংগ্রামের দীর্ঘপথে বহুমানুষ ঝরে যায় কিন্তু অবশিষ্ট জনতা উদ্যমকে সঙ্গী করে ঝড়-জলকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায় মুক্তিকামী পথের অন্বেষায়। কবির দৃঢ় বিশ্বাস সাধারণ মানুষের এই প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না। কবির গলায় ধরা পড়েছে সেই আত্মবিশ্বাস—

'প্রতারক
অন্ধমালার সাথে গান গায় আর
সর্বজ্ঞ বাচালেরা কাফেতে কাফেতে কূটকচালে মাতে; তবু
নুন-রুটি খুঁজে খুঁজে একদিন গোলক ধাঁধার শেষে ভোর
জলিখেত থেকে পায়ে কাদা নগ্নপদ মানুষেরা
তাহাদের পথ চিনে নেবে।'[১২৯] (পথ)

কবির এই ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হয়নি। সাধারণ মানুষ তাঁদের পথ খুঁজে পেয়েছিল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এরশাদের আমলেই এই আন্দোলন দানা বেঁধেছিল এবং চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের সংসদ নির্বাচনে এরশাদ পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হলেও এই জয় তাঁকে স্বস্তি দেয়নি। কারণ বিরোধীরা এই নির্বাচন বয়কট করেছিল। এরপর সাধারণ মানুষ ক্রমশই গুলি-বারুদের ভয়কে উপেক্ষা করেই বাংলাদেশের রাজপথে নেমেছিলেন নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে। সামরিক বাহিনির গুলিবৃষ্টি এবং বাংলাদেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত রাজপথে এভাবেই রচিত হয়েছিল স্বাধীনতার গান আর গণতন্ত্রের কবিতা—

'রাজধানীর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম পথ
ক্রমশ ছোট হতে থাকে মিছিলে মিছিলে।
জলের মতো ঘুরপাক খায় জনজোয়ার
কারফিউর আগ্রাসী থাবা তাড়া-খাওয়া বেড়ালের
লেজ হয়ে গুটিয়ে যায়;
জনগণ ধীরে পোড়া হৃদয় মেলে দ্যায় গণতান্ত্রিক
হাওয়ায়।'[১৩০] (গণতান্ত্রিক হাওয়া)

এরশাদ-বিরোধী যে আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছিল তা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে তীব্রতা লাভ করে। আন্দোলনের তীব্রতা এতটাই আগ্রাসী ছিল যে এরশাদ সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রীসহ উনিশজন সাংসদ পদত্যাগ করেন। ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সমস্ত কোর্টের আইনজীবীরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষণা করে জনগণের আন্দোলনে যোগদান করেন। ৩ ডিসেম্বর সেনাবাহিনী জানিয়ে দেয় যে তারা এই গণ-আন্দোলনে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না। যে সেনাবাহিনীকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে প্রায় একদশক এরশাদ বাংলাদেশের শাসনক্ষমতাকে কুক্ষীগত করে রেখেছিলেন সেই সেনাবাহিনীর অবস্থান পরিবর্তন এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরতে বাধ্য করে। ৬ ডিসেম্বর দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের চাপে এরশাদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর

করতে বাধ্য হন। অনেক মৃত্যু এবং দীর্ঘ রক্তাক্ত পথ অতিক্রম শেষে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে এরশাদের নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসান হয়। শুরু হয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাত্রা। সামরিক বাহিনীর একদশকের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ পুনরায় গণতন্ত্রের উত্তাল তরঙ্গে ভর করে পথ চলা শুরু করে। দীর্ঘ সামরিক শাসনের বেড়াজাল ভাঙা মুক্তির এই উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে একাধিক কবির কবিতা—

১) 'উনিশ শ' নব্বই-এর বাংলাদেশ
কম্পিত হাতে করমর্দন করে ভবিষ্যতকে
আকাশে তখন উল্কার মতো
বিজয়ী বেলুন ওড়ে.....
নব্বই-এর রাজপথ রক্তে লেখে স্বাধীনতা-নাম
নব্বই-এর বাংলাদেশ উল্লাস ভঙ্গিতে দেখে
যুবহাতে পত্‌পত্‌ বিজয় পতাকা।'[১৩১] (উনিশ শ' নব্বই)

২) 'রক্ত অশ্রু বিপ্লব ও প্রার্থনার ধ্বনি
একাকার মিশে যাচ্ছে সকল স্কোয়ারে
পৃথিবীতে আজ বদল প্রয়াসী দিন...
এখন আরাধ্য কাজ শুধু জেগে ওঠা।'[১৩২] (কালঘুম)

৩) 'মোহময় জীবনের সমস্ত কালভার্ট
ভেঙে দিয়ে
হে জীবন হে কবিতা
আলোর দিকে ফিরে যাবো আমরা
প্রিয় হয়ে ওঠা সেই মানুষগুলোর দিকে
যাঁরা প্রগতি যাঁরা সভ্যতা

নতুনের দিকে যাব প্রতিবার—'[১৩৩] (ক্রমশ জীবনের দিকে)

৪) 'যুদ্ধাহত আমি—আমার সন্তান জানে
তার পিতৃপরিচয়;
পিতৃগর্বে গর্বিত সেঃ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান;
একাত্তরে বিজয়ী পিতার বিশবছরের সব
ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ফেলে দৃঢ় নব্বুইয়ের সন্তান
উদ্ধার করেছে আজ শুচিশুভ্র রজনীগন্ধারে...'[১৩৪] (তোমাকে
অভিবাদন, রজনীগন্ধা)

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালির সংগ্রামই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন করেছিল। ভাষাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বাঙালির আপসহীন সংগ্রাম সে-দিনের লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে যে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার প্রকাশ ঘটেছিল স্বাধিকার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, পরিণতি লাভ করেছিল একাত্তরের মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও স্বাধীনতার সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বাংলাদেশের জনগণের জীবনে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় পুঁজিবাদী শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকদের হাতে। নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে হয় বাংলাদেশের জনগণকে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানে পুনরায় স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশের মানুষ ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের স্বাধীনতাকে। প্রতিষ্ঠিত করেছে গণতন্ত্রকে। আগামী দিনে সুস্থ সমাজ গঠনে তাঁরা আশাবাদী। এই আশাবাদের শরিক দেশের কবিরাও। সে-কারণে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের স্বপ্নভঙ্গ, নৈতিক মূল্যবোধের বিনষ্টি, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভাঙনকে অতিক্রম করেও বাংলাদেশের কবিতায় নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার আশা বারবার ধ্বনিত হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. গোলাম মুরশিদ, ''নক্ষত্রের পতন'', 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস', প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২০৫

২. অলি আহাদ, 'বাকশাল গঠন'', 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে' ১৯৭৫', বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পঞ্চম সংস্করণ অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৪৭৫

৩. গোলাম মুরশিদ, ''প্রথম বাংলাদেশ, শেষ বাংলাদেশ'', 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস', প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৪৫

৪. অলি আহাদ, ''বাংলাদেশে ভারতীয় স্বার্থ'', 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে' ১৯৭৫', বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পঞ্চম সংস্করণ অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৪৩১

৫. এম এম আকাশ, ''পরনির্ভরশীল বাংলাদেশ'', 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ', প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৯৮

৬. তানভীর মোকাম্মেল, ''ভূমিহীনতা ও ক্ষেতমজুর পেশার বিকাশ'', 'ক্ষেতমজুর আন্দোলন শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্য', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, পৃ. ১২

৭. রফিকউল্লাহ খান, ''মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বাংলা কবিতা : ভাবরূপের পালাবদল'', 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', দুই বাংলার কবি ও কবিতা, তাপস ভৌমিক (সম্পা.), কলকাতা, শারদীয়া ২০১৫, পৃ. ১১২-১১৩

৮. হাসান হাফিজুর রহমান, ''আমার আনুগত্য'', 'যখন উদ্যত সঙ্গিন', সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৮৯

৯. নির্মলেন্দু গুণ, ''আমার স্বপ্ন ছিল'', 'নির্বাচিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ ২০০০, পৃ. ৫৯

১০. শামসুর রাহমান, ''কোনদিকে'', 'দু ঃসময়ে মুখোমুখি' কবিতা সমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৮২

১১. হাসান হাফিজুর রহমান, ''এখন জ্যান্ত মানুষের মতো'', 'যখন উদ্যত সঙ্গিন', সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৮৭

১২. মহাদেব সাহা, ''এখন তোমাকে'', 'মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩৯

১৩. মাহবুব হাসান, ''বিজয় আমার স্বাধীনতা'', 'তন্দ্রার কোলে হরিণ', অয়ন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৯, পৃ. ৬৩

১৪. আবিদ আজাদ, ''আমি বলছি কিচ্ছু হবে না'', 'বনতরুদের মর্ম', কবিতাসমগ্র, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

১৫. রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ''হাড়েরও ঘরখানি'', 'রচনাসমগ্র' (প্রথম খণ্ড), অসীম সাহা (সম্পা.), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৬৬

১৬. বিমল গুহ, ''বাতাসে পুরানো গন্ধ'', 'সাঁকো পার হলে খোলাপথ', নির্বাচিত কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৬

১৭. ময়ুখ চৌধুরী, ''প্লেগের শহর'', 'কালো বরফের প্রতিবেশী', ডান হাতের পাঁচটি আঙুল, বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

১৮. মহাদেব সাহা, ''ভালোবাসি বলে দেশ তারাই মাতায়'', 'মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৭৫

১৯. আবু হাসান শাহরিয়ার, ''আশ্চর্য সময়'', 'অব্যর্থ আঙুল', শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভাষাচিত্র, ঢাকা, প্রথম ভাষাচিত্র সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৯

২০. নাসির আহমেদ, ''আমার সময়'', 'কবিতাসমগ্র', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২০-২১

২১. জাহিদ হায়দার, ''হেলমেট পরা ছায়া'', 'স্বাগত কালের পর্যটক', নির্বাচিত কবিতা, জয়তী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআয়ি ২০১৬, পৃ. ২৯

২২. কামাল চৌধুরী, 'মুক্তি ও বিপ্লব-এর কবিতা'', 'টানাপোড়েনের দিন', কবিতাসংগ্রহ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৫৭

২৩. শিহাব সরকার, ''আর্তনাদ করছে মানুষের প্রেত'', 'লাল যৌবন দিন', কবিতা সমগ্র ১, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২২

২৪. মুজিবুল হক কবীর, ''অগ্নিময় রাত'', 'নির্বাচিত কবিতা', অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১১

২৫. শিমুল মাহমুদ, ''পাটরচনা'', 'মস্তিষ্কে দিনরাত্রি', কবিতাসংগ্রহ সপ্তহস্ত সমুদ্রসংলাপ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৪, পৃ. ২৭০

২৬. শাহীন রেজা, ''কেন ভুল পথে যাবো'', 'নির্বাচিত কবিতা', অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১

২৭. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ''এলিয়েন'', 'তিন রমণীর ক্বাসিদা', কবিতা সংগ্রহ, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩৬

২৮. মারুফুল ইসলাম, ''বিপ্রতীপ'', 'নির্বাচিত কবিতা', অ্যাডন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৬

২৯. মজিদ মাহমুদ, ''মাহফুজা মঙ্গল'', 'মাহফুজামঙ্গল', শ্রেষ্ঠ কবিতা, আদর্শ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২২

৩০. তারিক সুজাত, ''সময়কে আমি উল্টো পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছি'', 'সময়কে আমি উল্টো পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছি', কবিতা সংগ্রহ, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৫৫

৩১. বিষ্ণু বিশ্বাস, ''ভোরের মন্দির'', 'ভোরের মন্দির', সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ (সম্পা.), যুক্ত, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৪

৩২. শোয়েব শাদাব, ''শবগাড়ি'', 'অশেষ প্রস্তরযুগ', কবিতা সংগ্রহ, উলুখড়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৫

৩৩. সুহিতা সুলতানা, ''করতলে অবিশ্বাস'', 'দুঃসহ শুদ্ধতা', নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৮, পৃ. ২৩

৩৪. মোহাম্মদ সাদিক, ''জন্মান্তর'', 'শ্রেষ্ঠকবিতা', অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১০, পৃ. ৩৩

৩৫. সাঈদ-উর-রহমান, ''ইন্দিরা গান্ধী জবাব দেবেন কি?'', '১৯৭২ ১৯৭৫ কয়েকটি দলিল', মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃ. ৯১

৩৬. হাসান হাফিজুর রহমান, ''বারুদ'', 'বজ্রে চেরা আঁধার আমার', কাব্যসমগ্র, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১, পৃ. ২২৯

৩৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৭১)', ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ৭০৬

৩৮. নির্মলেন্দু গুণ, ''স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'', 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা সমগ্র', প্রচলন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৪৫

৩৯. সানাউল হক, ''সাতই মার্চ একাত্তর'', 'একটি ইচ্ছা সহস্র পালে', সানাউল হকের নির্বাচিত কবিতা, নবাশা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১১৭

৪০. গোলাম কিরবিয়া পিনু, ''জাতির জাতীয় জনসভা'', 'এখন সাইরেন বাজানোর সময়', পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ৩৪

৪১. আবিদ আনোয়ার, ''প্রতিরোধ: একাত্তর'', 'স্বৈরিণীর ঘরসংসার', কাব্যসংসার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯১

৪২. কামাল চৌধুরী, ''১০ জানুয়ারি ১৯৭২'', 'ধূলি ও সাগর দৃশ্য', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৮৪

৪৩. গোলাম মুরশিদ, ''নক্ষত্রের পতন'', 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস', প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২১৮

৪৪. নির্মলেন্দু গুণ, ''সেই রাত্রির কল্পকাহিনি'', 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা সমগ্র', প্রচলন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৪৩

৪৫. রফিক আজাদ, ''এই সিঁড়ি'', 'পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

৪৬. মহাদেব সাহা, ''আমি কি বলতে পেরেছিলাম'', 'তোমার পায়ের শব্দ', শ্রেষ্ঠকবিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৭৪

৪৫. শামসুর রাহমান, ''ইলেকট্রার গান'', 'ইকারুসের আকাশ', কবিতা সমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫

৪৬. কামাল চৌধুরী, ''টুঙ্গীপাড়া গ্রাম থেকে'', 'মিছিলের সমান বয়সী', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪৩

৪৭. শহীদ কাদরী, ''হন্তারকের প্রতি'', 'আমার চুম্বনগুলো পৌছে দাও', অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ২২

৪৮. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (অনু), ''ট্রয়যুদ্ধ'', 'গ্রীকপুরাণ কথা', তুলি-কলম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ১৪৯

৪৯. শামসুর রাহমান, ''ইলেকট্রার গান'', 'ইকারুসের আকাশ', কবিতাসমগ্র ১, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৪৭৪

৫০. কামাল চৌধুরী, ''বীরের এ রক্তস্রোত'', 'ধূলি ও সাগর দৃশ্য', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪৩

৫১. মহাদেব সাহা, ''টুঙ্গিপাড়া'', 'বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ', শ্রেষ্ঠকবিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৯৬

৫২. কামাল চৌধুরী, ''বীরের এ রক্তস্রোত'', 'ধূলি ও সাগর দৃশ্য', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৯৩

৫৩. মহাদেব সাহা, ''তোমার অভাবে এই স্বাধীনতা'', 'মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৪৫

৫৪. মহাদেব সাহা, ''মুজিব হত্যার বিচার চাই'', তদেব, পৃ. ২৭

৫৫. আসলাম সানী, ''পিতৃহত্যার প্রতিশোধে'', 'কবিনামা', কবিতাসমগ্র, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১৪

৫৬. শিহাব সরকার, ''পিতা'', 'লাল যৌবন দিন', কবিতাসমগ্র (১), নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৩

৫৭. মহাদেব সাহা, ''আমার সোনার বাংলা'', 'তোমার পায়ের শব্দ', শ্রেষ্ঠ কবিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৭৯

৫৮. সৈয়দ শামসুল হক, ''একদা একটি দেশ ছিল'', 'রাজনৈতিক কবিতা', অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৮২

৫৯. গোলাম কিরবিয়া পিনু, ''জাতির জাতীয় জনসভা'', 'এখন সাইরেন বাজানোর সময়', পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ৩৪

৬০. গোলাম মুরশিদ, ''প্রথম বাংলাদেশ, শেষ বাংলাদেশ'', 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস', প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৪৩-২৪৪

৬১. রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ''বাতাসে লাশের গন্ধ'', 'রচনাসমগ্র' (প্রথম খণ্ড), অসীম সাহা (সম্পা.), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১৯

৬২. নির্মলেন্দু গুণ, ''একটি পুরনো কবিতা'', 'রাজনৈতিক কবিতা', বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৫৭

৬৩. জাহিদ হায়দার, ''কবির প্রবেশ নিষেধ'', 'খোলা দরোজার দিন', নির্বাচিত কবিতা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৯

৬৪. শিহাব সরকার, ''অন্ধকার'', 'কলিযুগ ও অন্যান্য কবিতা', 'কবিতাসমগ্র, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৪৫

৬৫. মোহন রায়হান, ''বসু তোমাকে মনে পড়ে যায়'', 'কবিতা গণআন্দোলন', মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৫২

৬৬. মোহাম্মদ রফিক, ''খোলা কবিতা'', 'খোলা কবিতা', নির্বাচিত কবিতা, প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৮৭

৬৭. নির্মলেন্দু গুণ, ''একটি পুরনো কবিতা'', 'রাজনৈতিক কবিতা', বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৫৭-৫৮

৬৮. মারুফ রায়হান, ''আশির দশক'', 'স্বপ্নভস্মের চারুকর্ম', শত কবিতা সতত কবিতা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৪

৬৯. বিমল গুহ, ''লিফলেট বোঝাই ট্রাক'', 'সাঁকো পার হলে খোলাপথ', নির্বাচিত কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬০

৭০. ফরহাদ মজহার, ''লেফটেনান্ট জেনারেল ট্রাক'', 'খসড়া গদ্য', শ্রেষ্ঠ কবিতা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০

৭১. মেজর রফিকুল ইসলাম, ''রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনে ব্যর্থতা'', 'স্বৈরশাসনের নয় বছর', শব্দশৈলী, ঢাকা, শব্দশৈলী প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১৭, পৃ. ৯৪

৭২. মুজিবুল হক কবীর, ''বারুদের গন্ধ আসে'' 'নির্বাচিত কবিতা', অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮৬

৭৩. নির্মলেন্দু গুণ, ''রাজদন্ড'', 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা সমগ্র', প্রচলন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৮৯

৭৪. ময়ুখ চৌধুরী, ''জন্মান্তর'', 'কালো বরফের প্রতিবেশী', ডান হাতের পাঁচটি আঙুল, বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৪০

৭৫. হামিদুল হক মুন্সী, ''স্বৈরাচার'', 'কবিতা গণআন্দোলন', মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৯৬

৭৬. শোয়েব শাদাব, ''স্বগতোক্তি'', 'অশেষ প্রস্তরযুগ', কবিতা সংগ্রহ, উলুখড়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১১

৭৭. দুলাল সরকার, ''দাগ'', 'নারীকে ছোঁব না, ফুলকে ছোঁব না', কবিতা সংগ্রহ, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৩, পৃ. ৮৭

৭৮. নাসির আহমেদ, ''হায় পোড়া দেশ'', 'কবিতাসমগ্র', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৩১

৭৯. মতিউর রহমান, ''ভূমিকা'', 'শহীদ নূর হোসেন', শামসুর রাহমান, মতিউর রহমান (সম্পা.), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রথমা সংস্করণ নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ৮

৮০. শামসুর রাহমান, ''বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'', তদেব, পৃ. ১৭

৮১. শামসুর রাহমান, ''একজন শহীদের মা বলছেন'', তদেব, পৃ. ২৮

৮২. নির্মলেন্দু গুণ, ''নূর হোসেন'', '১৯৮৭', নির্বাচিতা, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ জুলাই ২০০০, পৃ. ২৫২

৮২. মহাদেব সাহা, ''এই কবিতার নাম নূর হোসেন'', 'রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৯১

৮৪. আবু বকর সিদ্দিক, ''নব্বইয়ের স্বাধীনতা'', 'কবিতা গণআন্দোলন', মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ১৫

৮৫. ময়ুখ চৌধুরী, ''নূর হোসেন, সংসদে যাবে না?'', 'আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে', ডান হাতের পাঁচটি আঙুল, বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৯৫

৮৬. হাসান হাফিজ, ''নূর হোসেন : লাল গোলাপের নাম'', 'কবিতা গণআন্দোলন', মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৫২

৮৭. সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, ''নূর হোসেন'', 'কবিতা গণআন্দোলন', মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৬০

৮৮. আবিদ আনোয়ার, শহীদ নূর হোসেন : অমর ভাস্কর্য নাকি ভাস্কর্য নিজেই'', 'মরা জোছনায় মধুচন্দ্রিমা', কাব্যসংসার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬০

৮৯. আসমাল সানী, ''মিছিলের মতো দীর্ঘতর নূর হোসেন'', 'কবিনামা', কবিতাসমগ্র, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১১

৯০. মহাদেব সাহা, 'একটি মিছিলের প্রতীক্ষা'', 'মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৯৭

৯১. বিমল গুহ, ''নূর হোসেন'', 'নষ্ট মানুষ ও অন্যান্য কবিতা', নির্বাচিতা কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১২৪

৯২. মেজর রফিকুল ইসলাম, ''পূর্বকথন'', 'স্বৈরশাসনের নয় বছর', শব্দশৈলী, ঢাকা, শব্দশৈলী প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১৭, পৃ. ১৭

৯৩. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ''অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯০'', 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জী ১৯৭১-২০১১', প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, অগাস্ট ২০১৩, পৃ. ৮১

৯৪. ফেরদৌস নাহার, ''বাংলাদেশ রেগে গেছে'', 'উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম', নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ২০

৯৫. মহাদেব সাহা, ''বাংলাদেশ চায় না তোমাকে'', 'মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৯৩

৯৬. আব্দুল হাই শিকদার, ''ডিসেম্বর '৯০'', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', নব প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৫৫

৯৭. হাসান হাফিজুর রহমান, ''একটি সাক্ষাৎকারের প্রত্যাশায়'', 'যখন উদ্যত সঙ্গিন', সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৮৮

৯৮. রফিক আজাদ, ''ভাত দে হারামজাদা'', 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১০৩

৯৯. কামাল চৌধুরী, ''অনাহারী মানুষের কথা'', 'মিছিলের সমান বয়সী', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪৭

১০০. হেলাল হাফিজ, ''একটি পতাকা পেলে'', 'যে জলে আগুন জ্বলে', দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ষড়বিংশ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৩৮

১০১. হেলাল মহিউদ্দীন, 'নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব', সেন্টার ফর এ্যাপ্লায়েড সোস্যাস স্টাডিজ, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৭, পৃ. ১০৪

১০২. মহাদেব সাহা, ''দিনমজুরের গান'', 'মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৬৮

১০৩. নির্মলেন্দু গুণ, ''তার আগে চাই সমাজতন্ত্র'', 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র', নির্বাচিতা, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ ২০০০, পৃ. ১২৭

১০৪. বিমল গুহ, ''ক্ষুধার্ত মানুষ পারে'', 'স্বপ্নে জ্বলে শর্তহীন ভোর', নির্বাচিতা কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮৫

১০৫. জাহিদ হায়দার, ''স্বপ্ন দেখার জন্যে আবেদনপত্র'', 'অগ্নিগণ সখা আমার', নির্বাচিত কবিতা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৩৬

১০৬. কামাল চৌধুরী, ''খরা'', 'মিছিলের সমান বয়সী', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৫৩

১০৭. আবিদ আনোয়ার, ''প্রিয় দেশবাসী'', 'স্বৈরিণীর ঘরসংসার', কাব্যসংসার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৮৯

১০৮. কামাল চৌধুরী, ''আকাঙ্ক্ষার চাষাবাদ'', 'টানাপোড়েনের দিন', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬৭

১০৯. শিহাব সরকার, ''কলিযুগ'', 'কলিযুগ ও অন্যান্য কবিতা', 'কবিতাসমগ্র, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৬৩

১১০. জাহাঙ্গীর ফিরোজ, ''স্পার্টাকাস নেই'', 'চাকরিজীবীদের কোন স্পার্টাকাস নেই', কবিতাসমগ্র, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৫ম পৃ. ১২৩

১১১. জাহাঙ্গীর ফিরোজ, ''শহর'', 'বদ্ধ মাতাল রোদে', কবিতাসমগ্র, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৫ম পৃ. ২৯

১১২. কামাল চৌধুরী, ''অন্ধকারের মেয়ে'', 'টানাপোড়েনের দিন', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭৬

১১৩. মুজিবুল হক কবীর, ''আগ্রাসন'' 'নির্বাচিত কবিতা', অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৯

১১৪. মাহমুদ কামাল, ''মুখোশ'', 'শব্দেরা কখনো মানতে চায় না', নির্বাচিত কবিতা, বিশদ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ বইমেলা ২০১৫, পৃ. ১২৫

১১৫. ইকবাল আজিজ, ''দুঃখের স্বরূপ'', 'নির্বাচিত কবিতা', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩২

১১৬. আবু হাসান শাহরিয়ার, ''কপট বলয়'', 'অব্যর্থ আঙুল', শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভাষাচিত্র, ঢাকা, প্রথম ভাষাচিত্র সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩১

১১৭. নাসির আহমেদ, ''উড়েছে পতাকা তবু'', 'কবিতাসমগ্র', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৪

১১৮. হাসান হাফিজ, ''চারদিক বীজাণু ও ধোঁয়া'', 'অবাধ্য অর্জুন', অনন্যা, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮৪

১১৯. আবিদ আনোয়ার, ''বসবাস'', 'মরা জোছনায় মধুচন্দ্রিমা', কাব্যসংসার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৫১-৫২

১২০. তিতাশ চৌধুরী, ''মানুষে বিশ্বাস রাখি না'', 'তুমি সুখেই আছো নন্দিনী'', নির্বাচিত কবিতা, গতিধারা, ঢাকা, পএথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১৫

১২১. দুলাল সরকার, ''মধ্যবিত্ত'', 'আমি বিরুদ্ধে দাঁড়াবো', কবিতা সংগ্রহ, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৩, পৃ. ৭৫

১২২. আবিদ আনোয়ার, ''কবলিত মানচিত্রে'', 'প্রতিবিম্বের মমি', কাব্যসংসার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৫

১২৩. মহাদেব সাহা, ''আমি ছিন্নভিন্ন'', 'মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৭৪

১২৪. সৈয়দ শামসুল হক, ''আমি জন্মগ্রহণ করিনি'', 'রাজনৈতিক কবিতা', অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৯৬

১২৫. মতিন বৈরাগী, ''মানসিক খরার দিনে'', 'কাছের মানুষ পাশের বাড়ি', নির্বাচিত কবিতা, দেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬, পৃ. ২৩৪

১২৬. অসীম সাহা, ''না আমরা কেউ কাঁদবো না'', 'অসীম সাহার সেরা কবিতা', শোভা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৯৮

১২৭. মতিন বৈরাগী, ''জেগে ওঠো সাহসী মানুষ'', 'খরায় পীড়িত স্বদেশ', নির্বাচিত কবিতা, দেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬, পৃ. ২২১

১২৮. বিমল গুহ, ''আগামী উৎসব'', 'সাঁকো পার হলে খোলাপথ', নির্বাচিতা কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬৮

১২৯. জাহাঙ্গীর ফিরোজ, ''পথ'', 'বদ্ধ মাতাল রোদে', কবিতাসমগ্র, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৫, পৃ. ৫০

১৩০. মুজিবুল হক কবীর, ''গণতান্ত্রিক হাওয়া'' 'নির্বাচিত কবিতা', অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮১

১৩১. বিমল গুহ, ''ঊনিশ শ' নব্বই'', 'নষ্ট মানুষ ও অন্যান্য কবিতা', নির্বাচিতা কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১৯

১৩২. কামাল চৌধুরী, ''কালঘুম'', 'টানাপোড়েনের দিন', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭১

১৩৩. মতিন বৈরাগী, ''ক্রমশ জীবনের দিকে'', 'বিষণ্ণ প্রহরে দ্বিধাহীন', নির্বাচিত কবিতা, দেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬, পৃ. ২৪০

১৩৪. রফিক আজাদ, ''তোমাকে অভিবাদন, রজনীগন্ধা'', কবিতা একানব্বই'', লতা হোসেন (সম্পা.), সানন্দ প্রকাশ, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ৯২, পৃ. ২৬